গ্রামে ও পথে

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের
ভূমিকা সম্বলিত

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

দি বুক এম্পোরিয়ম্ লিমিটেড
২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ়—১৩৫২

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

—দাম দুই টাকা—

SL.NO. 066857

শক্তি প্রেস ২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীঅজিতকুমার বসু, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা

শ্রীমান রতনমণি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'গ্রামে ও পথে' পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। রতনমণি একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্ম্মী। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়া যাহারা ঘর ছাড়িয়া পথে নামিয়াছিল এবং তদবধি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দুর্ভোগকে বরণ করিয়া লইয়া যাহারা জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া রহিয়াছে রতনমণি তাহাদের অন্যতম। সুদীর্ঘ বিশ বছরের জনসেবার বিচিত্র ও বিবিধ অভিজ্ঞতা আলোচ্য গ্রন্থে লেখক শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

'গ্রামে ও পথে' জনৈক জনসেবাব্রতী কর্ম্মীর ডায়েরী। 'গ্রাম' অর্থে আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রামের কথা বলা হইলেও গ্রন্থে আলোচিত সমস্যাগুলি বাঙলা দেশের সর্ব্ব গ্রামের সমস্যা। নদীমাতৃক বাঙলা দেশের হাজা মজা নদনদীর সমস্যা, হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সমস্যা, বৃহত্তর ও কুটির-শিল্পের সমস্যা ইত্যাদি আজ সর্ব্ব ভারতীয় সমস্যা। চাষী ও নিরক্ষর লোকের সহিত কথোপকথনের ছলে রতনমণি সহজ ও সাবলীল ভাষায় এ সমস্তই আলোচনা করিয়াছেন। "ভাদ্র আশ্বিনে ঘর ঘর ম্যালেরিয়া,—মোটা মোটা পেট, কাটির মত হাত পা, আর কোটরগত চোখ,—কুইনাইনের পয়সা জোটে না"—এদের কথা আধুনিক বাঙলায় কয়জন শিক্ষিত লোক সত্য সত্যই ভাবেন? এদের জীবনধারার সহস্র ত্রুটি বিচ্যুতি এবং অগণিত অভাব লইয়া হা হুতাশ ও সহানুভূতি প্রকাশ অনেক দেখিলাম, কিন্তু

"জালা জালা পাঁচন" তৈরী করিয়া গরীব লোককে অন্ততঃ "দু-খোরাক ঔষধ" দিতে ক'জন অগ্রণী হইল? সমস্যা অনেক আছে কিন্তু তাহার সমাধানের ইঙ্গিত কোথায়? দরিদ্র-সেবাব্রতী কথোপকথনের ছলে এ ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা কেতাবী ইঙ্গিত নয়—কোন 'ইজম্' এতে নাই—পল্লীবাসীর অভাব অভিযোগকে নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়া এই সব সমস্যার সমাধান করিতে হইবে ইহাই হইল আলোচ্য গ্রন্থের মূল তত্ত্ব।

পল্লীবাসী যখন প্রশ্ন করে বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার জলে কেন বিপদ ঘটায়, তখন অনেক তথ্য দিয়ে ছবি এঁকে ম্যাপ ধ'রে জলের মত ক'রে সে তত্ত্ব বুঝিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু পল্লীবাসীর নিরুপায় কণ্ঠের প্রশ্ন—"এর প্রতিকারের কি কোন উপায় নাই?"—সকলকেই দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগে বাধ্য করে।

'গ্রামে ও পথে' গ্রাম্য জীবনের হুবহু চিত্র। গ্রামের কথা যাঁরা বিন্দুমাত্র চিন্তা করেন তাঁহারা এই পুস্তকখানি অন্ততঃ একবার দেখিবেন এ বিশ্বাস আমার আছে।

পুস্তকখানির ভাষা অতি মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। রত্নমণি শুধু মাত্র কর্ম্মী নন, সাহিত্যিকও বটে। আমার বিশ্বাস জটিল তত্ত্ব কত সহজ ভাষায় প্রকাশ করা যায় 'গ্রামে ও পথে' তাহা সহজেই বুঝাইয়া দিবে।

সায়েন্স কলেজ
কলিকাতা
২রা এপ্রিল, ১৯৪১

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

গ্রাম-পথের পথিক

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের

করকমলে

প্রকাশকের নিবেদন

'গ্রামে ও পথে' পুনর্মুদ্রিত হইল। আচার্য্য প্রফুল্ল-চন্দ্রের লিখিত ভূমিকায় বইখানি সমৃদ্ধ। ভূমিকায় স্বর্গগত আচার্য্য মহোদয় বলিয়াছেন "গ্রাম অর্থে আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রামের কথা বলা হইলেও গ্রন্থে আলোচিত সমস্যাগুলি বাঙলা দেশের সর্ব্বগ্রামের সমস্যা * * * * —আজ সর্ব্বভারতীয় সমস্যা।" ভারতে জাতীয় জীবন বিকাশের বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রামের দিকে একান্তভাবে লক্ষ্য করিবার সময় আসিয়াছে। অথচ গ্রাম ও সহরের মধ্যে আজ বিচ্ছেদ অতলস্পর্শ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"দেশের যে অতি ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি, বিদ্যা ধন, মান সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশী। আমরা একদেশে আছি অথচ আমাদের এক দেশ নয়।" দুঃসহ এই বিচ্ছেদের মধ্যে মিলনের পথ খুঁজিবার প্রয়াস হইল 'গ্রামে ও পথে'র অন্তরের কথা। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহাই আমাদের নিবেদন। ইতি—

আষাঢ় ১৩৫২ প্রকাশক

নিবেদন

"গ্রামে ও পথে" কংগ্রেস-সেবীর ডায়েরী, গ্রাম ও পথ হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায়। শেষের দিকে কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। লেখাগুলি প্রায় সব গত বৎসরে জাতীয় সাপ্তাহিক "পত্রে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া "বাপুজী" ছবিখানি ছাপিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইতি—

এপ্রিল ১৯৪১ লেখক

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্"	...	১
গ্রামে ও পথে	...	৭
হিন্দুস্থান উথল যায়েগা	...	৯৫
পদ্মাতীরে	..	৯৭
"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"	...	১০৪
গান্ধীবাদ	...	১০৭
"হরিজন"	...	১১৩
খাদির কথা	...	১১৮
খাদি উৎসব	...	১২২
"তোমার রাখাল তোমার চাষী"	...	১২৯
পল্লী-প্রসঙ্গে অরবিন্দ	...	১৩২
মন্দির দ্বারে	...	১৩৯
দ্বার খুলিল	...	১৪৪
অহিংস সংগ্রামের রীতি	...	১৫৯

BAPUJI
12.4.1930

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্"

সর্ব্বভূতের প্রতি যিনি দ্বেষরহিত, যাঁর মৈত্রী ও করুণার ধারা ক্লান্ত পৃথ্বীকে অভিষিক্ত করিয়া দিতে চায়, সত্য ও শান্তির সনাতন ভিত্তির উপর যিনি জীর্ণ পুরাতন সমাজকে নবীন রূপ দিবার তপস্যা করেন, শুদ্ধ প্রেমের অভয় মন্ত্রে যিনি মানব-সমাজে নব চেতনা-সঞ্চারের স্বপ্ন দেখেন, আজ হিংসাবিক্ষুব্ধ বিংশ শতাব্দীতে এমন অদ্ভুত মানুষের প্রয়োজন কি সত্যই অনুভূত হয়? এরূপ মানুষের উপযোগিতা আজ অলীক ও অবাস্তব, অথবা সত্যই তার একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা আছে? যিনি ভোগসুখের প্রতি মমতা-শূন্য ও নিরহঙ্কার, সুখ-দুঃখে সমচিত্ত এবং ক্ষমাশীল, তিনি কি আজিকার সভ্য জগতে একটা খাপছাড়া আকস্মিক ব্যাপার, অথবা কার্য্যকারণ-পরম্পরার শৃঙ্খলায় তাঁর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে? যিনি যতাত্মা ও দৃঢ়নিশ্চয়, নিরলস ও ভয়শূন্য, যিনি অনপেক্ষ ও দক্ষ, তেজে ও শুচিতায় সূর্য্যালোকসদৃশ, সেই লোকোত্তর পুরুষ কি আসুরিক শক্তির জয়গৌরব-মুখরিত ত্রস্ত পৃথিবীর বুকে নিতান্তই প্রকৃতির খেয়ালের বশে আনীত

হইয়াছেন, অথবা তাঁর শুভাগমন অনাগত শুভযুগের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে ? যে যুগে ধনসম্পদমাত্রই মর্য্যাদার হেতু এবং সম্ভোগমাত্রই স্থখের হেতু বলিয়া দিগ্বিদিকে ঘোষিত হইতেছে, যে যুগে সত্যের শাশ্বত রূপ খণ্ডীকৃত ও অস্বীকৃত হইয়া, যাহা কিছু স্বার্থের বাহন তাহাই পরম আরাধ্য বলিয়া পূজিত হইতেছে, সেই প্রগতিশালী যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক যুগে এই বিত্তহীন, ভোগবিমুখ বৈরাগীর হস্তে কিসের পতাকা ? গান্ধীজী বিপ্লবের কি অভিনব বাণী আনিয়াছেন ?

স্বার্থের বেদীমূলে আজ মানুষ তার মানবধর্ম্মকে বলি দিয়াছে। "তৃষ্ণা রাক্ষসী" যত পায় আরও চায়,—তার মরুভূমির তৃষা মিটাইতে মানুষ তার সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। প্রবল নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত মানুষ বিজ্ঞানশাস্ত্র গড়িয়া তুলিল, বস্তুবিস্থার প্রয়োগের দ্বারা মহাযন্ত্রের স্মষ্টি করিল, তারপর সেই যন্ত্রটাকে চালাইয়া দিল দিকে দিকে, দেশে দেশে, মানব সমাজের বুকের উপর দিয়া। যন্ত্রের ঘর্ঘররবে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইয়া উঠিল, তার চক্রতলে মানুষ মথিত ও পিষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু নিজের স্মষ্টির নেশায় সে উন্মত্ত হইয়া আছে !—যন্ত্র যদি লক্ষ লোকের হৃৎপিণ্ড মুহূর্ত্তে ছিঁড়িয়া আনে, যন্ত্র যদি অগ্নিদাহে পলকে প্রলয় ঘটায়, ক্ষতি কি ? সে ত যন্ত্রেরই মহিমা ! মানুষ স্থধু মুগ্ধ হইয়া হাত যোড় করিয়া বলিতে থাকিবে—নমো যন্ত্র। যন্ত্রকে স্মষ্টি করিয়া, হায়, মানুষ যন্ত্রের দাস হইল, যন্ত্রকে তাহার দাস করিতে পারিল না।

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্"

যন্ত্রপূজায় একে একে মানুষের সত্যধর্ম্ম, দয়াধর্ম্ম, হৃদয়ধর্ম্ম, মানবধর্ম্ম সকলই বলি পড়িতেছে। মানবসমাজে জাতির সহিত জাতির, মানুষের সহিত মানুষের যোগসূত্র ছিঁড়িয়া যাইতেছে। ক্রমে যন্ত্রভাবাপন্ন মানুষের বুদ্ধিবিচারে মানবসমাজও মাত্র একটা যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য নাই, অস্তিত্ব নাই,—সে কেবল সমাজ-যন্ত্রের চাকা ঘুরাইবে। আহার-বিহার, চিন্তা-চেষ্টা, সর্ব্বত্রই সে সমাজের বাঁধা নিয়ম ও নির্দ্দেশ মানিয়া চলিবে, তাহারই বাঁধা বুলি আওড়াইবে,—অন্যথা রক্ষা নাই, সমাজযন্ত্রের চাকার তলে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সমস্ত রাষ্ট্র-যন্ত্রটাকে বুদ্ধি ও ব্যবস্থাবলে উদ্যত করিয়া তুলিয়া অপরকে আঘাত কর, তাহার ক্ষুধার অন্ন কাড়িয়া লও, তাহার তৃষ্ণার জল বিষাক্ত কর, তাহার ফসলের ক্ষেতে আগুন লাগাও, মাতার ক্রোড়ে তাহার শিশুকে বধ কর, মানুষের শক্তি জয়ী হউক।—মানবাত্মা মিথ্যা, মুক্তির কথা ধাপ্পাবাজী, শাশ্বত সত্য কবিকল্পনা, হৃদয়বৃত্তির কথা তুলিও না, সেটা দুর্ব্বলতা মাত্র।

সত্য ও সংযমে অপ্রতিষ্ঠ বলিয়াই শক্তিমান্ আজ এইরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার রথঘর্ঘরে মানবসমাজ উদ্বেজিত, মানুষের ভিতরকার দেবতা কাঁদিয়া মরিতেছে। শক্তির ভয়ঙ্করত্ব মানুষের আনন্দরস শোষণ করিয়া লইতেছে, মানবসমাজে মরুভূমির তপ্ত ভীষণতা দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে বিপুল হইয়া উঠিতেছে। বৈজ্ঞানিক যুগে বস্তুতান্ত্রিক মানব-সভ্যতা ভোগের উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টায় এমনই দেউলিয়া হইয়াছে

যে অবশ্যম্ভাবী আত্মঘাত হইতে পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। তাহার মধ্যে আজ এমন কোন সত্য নাই, এমন কোন নীতি নাই, এমন কোন ধর্ম্ম নাই, এমন কোন বিশ্বাস নাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিপাক হইতে সে উদ্ধার পাইতে পারে।

এই ঘোর অমানিশায়, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সম্বল করিয়া সত্যের হিরণ্ময় পতাকাহস্তে গান্ধীজী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—

"জানি নে পথ, নেই যে আলো,
ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তব চরণ শব্দ বরণ করেছি
আজি এই অরণ্য গভীরে।"

জটিল কর্ম্মপথে সত্যের চরণ-শব্দই তাঁহার সম্বল। সত্যের পথে এক পা অগ্রসর হইতে পারিলেই তিনি ধন্য,—"One step is enough for me." দুঃখ বরণ করিয়া দুঃখ হরণ করিবার এই মহৎ প্রয়াসে আমরা সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর মধ্যে সত্য ও প্রেমের যোদ্ধৃবেশই দেখিতে পাই,—যাহা মানুষের সহিত মানুষকে সত্যসম্পর্কে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কর্ম্মজগতে বিপ্লব আনিতে চায়। গান্ধীজীর আদর্শবাদ কল্পনা-বিলাস নয়। বহু কর্ম্মের মধ্যে ভারতীয় সমাজে সেই আদর্শকে রূপ দিবার জন্য তাঁহার অবিরাম ও অনলস চেষ্টা নির্জ্জীব দেশে প্রাণের প্লাবন আনিয়াছে। তাঁহার মরণজয়ী সত্য ও প্রেম মানুষকে "আত্মার

বন্ধনহীন আনন্দের গান" শুনাইয়াছে। ভারতীয় ঐক্য গান্ধীজীর মধ্যে সংসিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার সাধনায় ভারতবর্ষ আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছে। স্বাধীনতার পথে ভারতের যাত্রা সুরু হইয়াছে, কিন্তু এখনও পথের অনেক বাকী। এই দুর্গম পথযাত্রায় যিনি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সুমেরু-শিখরে সত্যের জ্যোতির্ম্ময় মূর্তি দেখাইয়া দেশকে অকুতোভয়ে কর্ম্মের পথে আহ্বান করিয়াছেন তিনি—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্ মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥"

এই ভক্তিমান্ কর্ম্মযোগীকে স্মরণ করিয়া ভারতের মুক্তি-সাধনায় আমরা যেন সত্যকে চিত্ত ভরিয়া লইতে পারি।

গ্রামে ও পথে

এক

কথাটা পুরানো হইয়া গেল,—নোকুণ্ডার মাঠে তখনও স্বদেশী মেলা চলিতেছে, আমরা বটের ছায়ায় সবুজ ঘাসের উপর বসিয়া সুতা কাটিতেছি। দিব্য ফুরফুরে দখিণ হাওয়া, চষা-মাঠের মিষ্ট গন্ধে ভরা,—প্রতিক্ষণে প্রাণ মন ভরিয়া দিতেছে। চরকা চলিতেছে, সঙ্গে গল্পও চলিতেছে, অর্থাৎ যদিচ চুপ করিয়াই চরকা কাটিবার কথা,—তবু অভ্যাসের গুণে আমরা কথা না বলিয়া এক তিল সময় ত নষ্ট করি না, তাই গল্পও চলিতেছে। এদিকে দেড় গণ্ডা ফোড়ার তাড়নায় কাবু হইয়া সম্পাদক তাঁর গোল দেহটি লম্বা করিয়া দিয়া শুইয়া আছেন,—মুখখানা বেদনায়, ব্যঙ্গে ও হাসিতে ভরা,—ঐ যাকে বলে আঁধারে-আলো ভাব। এমন সময় কেহ প্রশ্ন করিলেন, "চরকার ঘ্যান্ ঘ্যান্ ত প্রতিদিন শুনছি,—কিন্তু তার গুঞ্জন কোথায়,—তার সঙ্গীত?"

তীক্ষ্নকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ উত্তর হইল, "কান চাই ভাই, নহিলে

গান শোনা যায় না। আমাদের কানগুলো যে কানমলা খাবার, গান শোনবার ত নয়!"

"তার মানে?"

"তার মানে এই যে পাশ্চাত্য গুরুর কানমলা খেতে খেতে আমরা তার পাঠগুলো খুব যত্ন ক'রেই মুখস্থ ক'রে রেখেছি,—প্লেটো থেকে মার্কস্ পর্য্যন্ত কোন পাঠই বাদ যায় নি। কিন্তু মুখস্থ বিদ্যে ত, তার দৌড় আর কতটুকু? ওরা যা ভেবেছে, যা বুঝেছে, তাকেই সম্বল ক'রে বেরিয়ে প'ড়েছে প্রাণের সদর রাস্তায়,—জয় করবার দুর্ব্বার উল্লাসে। ওদের বিদ্যা হয়েছে ওদের প্রাণের সাধন, আর সেই বিদ্যাই হ'ল আমাদের পথের বাঁধন। কাজের রাস্তায় পা বাড়াতে গেলেই আমরা পদে পদে পাশ্চাত্য গুরুর পুঁথি খুলে বসছি,—দেখছি মিলছে কি না। ফলে আমাদের গতিপথে গরমিলই বেড়ে উঠছে,—তার ছন্দও থাকছে না, তালও থাকছে না। ওদের পুঁথির মধ্যে আমরা ওদের জয়-যাত্রার সঙ্গীত শুনতে পাই নি। আমরা বুলি শিখেছি,—বাণী আমাদের কানে পৌছয় নি।"

"ইস্, কথা যে ভারি লম্বা লম্বা হচ্ছে!"

"ধরেছ ঠিক, কেবল লম্বা কানে পৌছবে না এই যা দুঃখ।"

"যত দোষ কি আমাদের এই কানগুলোর?"

"নয় ত কি? বুলি দিয়ে আমাদের কান ঢেকে দিয়েছে যে,—সঙ্গীতের প্রবেশপথ সেখানে নেই। তাই চরকার বাণী সঙ্গীতের মত আমাদের কানে পৌছচ্ছে না। নহিলে নিঃস্ব,

নিরন্ন, নিষ্কর্ম্মা জাতির লক্ষ লক্ষ লোককে কাজের পথে আহ্বান করতে হ'লে আজ চরকা ছাড়া আমাদের গতি আছে কি? কয় ঘণ্টার কাজে কত উপায় হবে আজ প্রশ্ন ত এ নয়,—প্রশ্ন এই যে মানুষ হ'য়ে বাঁচতে হ'লে সবার জন্যে কাজ চাই, যে কাজ এক সূত্রে কোটি প্রাণকে বেঁধে দেবে। কর্ম্মহীনতার মারই হয়েছে এদেশে মানুষের উপর সব চেয়ে বড় মার।"

"বাঃ, বক্তৃতা বেশ হচ্ছে, কিন্তু চরকা কেটে স্বরাজ হ'বে একি সত্যিই বিশ্বাস কর? আজ বিজ্ঞানের রথে চ'ড়ে শিল্পের জয়যাত্রা চলেছে,—তার রথচক্রতলে চরকা বুড়ীর হাড় ত গুঁড়িয়ে গেল। তাকে পথের ধূলো থেকে তুলে এনে আর পাগলামী ক'রো না,—নিশ্চিন্ত হ'য়ে তাকে মরতে দাও।"

"বক্তা ত তুমিও কম নয় দেখছি। শিল্পের জয়যাত্রার কথা বলছ। কিন্তু দেখছ না, বিজ্ঞানের রথে শিল্পের জয়যাত্রা আজ যে পথে,—সেই পথের শতমুখে হিংসা রাক্ষসী মানুষের রক্ত শুষে খাচ্ছে,—সেই পথে মানুষের শবযাত্রার আর বিরাম নেই? শুনছ না, মানুষের কান্নায় সে পথের আকাশ বাতাস কাঁদছে? শিল্পের জয়যাত্রাই বটে! বস্তুর হাটে কড়ার মূল্যে মানুষ বিকিয়ে যাচ্ছে, তার বুকের উপর দিয়ে জুয়ো খেলা চলেছে,—যে ছিল ঘরের মানুষ গৃহশিল্প নিয়ে মুক্ত আকাশের তলে, সে আজ হ'ল কলের কুলি কারখানা-ঘরের দুষ্ট অবরোধের মধ্যে। দেখছ না, যন্ত্রকে সৃষ্টি ক'রে মানুষ আজ করযোড়ে তার পূজা সুরু ক'রে দিয়েছে। যন্ত্র যোগাচ্ছে ভোগের উপকরণ, লালসার ইন্ধন,—মানুষের

ভিতরের পশুটা তাই খুসীতে ফুলে ফুলে উঠছে, আর তার দেবতা মরছে কেঁদে—। সাধু শ্রমের শোষণহীন সরল পথেই মানুষের এই বন্দীদশা ঘুচতে পারে। তাই সাত লক্ষ শ্রীহীন গ্রামের দেশ এই ভারতবর্ষে চরকা হচ্ছে স্বরাজ-সাধনের অস্ত্র, অহিংসার প্রতীক।"

কথাবার্ত্তা জমিয়া আসিতেছিল, এমন সময় "দেখুন, দেখুন" বলিয়া সম্পাদক হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। উঠিবার উৎসাহে তাঁহার ফোড়া ফাটিয়া গেল। চরকা হইতে চোখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনি সলজ্জ বিনয়ে বলিলেন, "ঐ দিকে"।

ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, মাঠের উপর দিয়া এক চাষী গরু তাড়াইয়া লইয়া আসিতেছে। গরুর পিঠে ছালা, আর ছালার উপর ত্রিবর্ণরঞ্জিত একটি ছোট পতাকা। সম্পাদকের উৎসাহের কারণ বুঝিলাম। তিনি তখন ফাটা ফোড়ায় ফুঁ দিতেছেন। গরু ক্রমে নিকটে আসিল। চাষীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ছালায় কি আছে গো?"

সে বলিল, "কি আঁর আছে মশাই,—ক'টা কুমড়ো আর কিছু চাল কংগ্রেসের জন্য নিয়ে এলুম। আমরা গরীব মানুষ।"

গরীব বলিয়া সে কৈফিয়ৎ দিল,—তার কুণ্ঠা ছিল যে সামান্য জিনিষ আনিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি এই সামান্য জিনিষ আজ আমাদের কাছে কত অসামান্য,—পয়সা দিয়া ইহার মূল্য নিরূপণ হয় না। স্বরাজের বাণী যে চাষীর ঘরে পৌছিয়াছে, কংগ্রেসের আহ্বানে সে যে সাড়া দিতেছে,—গণ-আন্দোলনে এই ত আমাদের সম্বল। টাউন হলের মাথার উপর ঘটা করিয়া

কংগ্রেস-পতাকা উত্তোলন করা হয়, বড় বড় সভা-সমিতিতে বা শোভাযাত্রায় জাতীয় পতাকা শোভাবৃদ্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু হালের গরুর পিঠে এই চলমান স্বদেশীর ধ্বজা গ্রামে গ্রামে ও পথে পথে যখন নীরবে ও নিশ্চিন্তরূপে গণমনের জাগৃতি ঘোষণা করিতে থাকে, তখন স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে জাগে যে গণ-মনের পথ কে খুলিয়া দিল, কাহার যাদু স্পর্শে এই নব চেতনা জাগিল। প্রশ্নের উত্তরে চরকার কথাই আগে মনে পড়ে।

মনে পড়ে, ১৩২০ সনের দামোদরের বন্যায় যখন পশ্চিম বঙ্গের অর্দ্ধেক ভাসিয়া যায়, তখন স্বদেশপ্রেমিক শিক্ষিত যুবকের দল জনসেবার আহ্বানে বন্যা-পীড়িত অঞ্চলে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেবা-কার্য্য শেষ হইবার সঙ্গেই গ্রামের সহিত তাঁহাদের সম্পর্কও কার্য্যতঃ শেষ হইয়া যায়। গণ-আন্দোলনের পথে স্বাধীনতা-লাভের কথা তখন যদি বা কেহ অস্পষ্টরূপে ভাবিয়া থাকেন, তবু এরূপ কোন কর্ম্ম-ক্রম সে সময়ে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই, যাহা কর্ম্মিগণকে গ্রাম-অঞ্চলে ধরিয়া রাখিতে পারে। ফলে গণ-সংযোগের পথ পাইয়াও সে পথ তখন অচেনা রহিয়াই গেল। তারপর অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজী যখন চরকার বাণী দিয়া কর্ম্মিগণকে গ্রামের দিকে আহ্বান করিলেন, তখন এই নূতন পথ-কাটার কাজ সুরু হইল। কর্ম্মিগণ সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ছিলেন সন্দেহ নাই,—কিন্তু সে মুষ্টি সুবর্ণের মুষ্টি। চরকা তাঁহাদের গ্রামে ধরিয়া রাখিল। গ্রামে থাকিয়া তাঁহারা গ্রাম চিনিলেন, গ্রাম চিনিয়া সাত লক্ষ গ্রামের দেশ এই ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ

তাঁহারা দেখিলেন। চরকার সূত্রে গ্রামের সহিত সত্যকার মিলন ঘটিল বলিয়াই কর্ম্মিগণ গ্রামে বসিয়া গ্রামের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ঠিকমত বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাদের নবদৃষ্টি লাভ হইল।

প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যখন পতনের মুখে, তখন দেশের ঘরে ঘরে চরকা ছিল। কিন্তু চরকাই ছিল, চেতনা ছিল না,—বহু লক্ষ চরকার দ্বারা বহু লক্ষ লোকের মন তখন স্বরাজ-সাধনের ক্ষেত্রে এক সূত্রে গ্রথিত হয় নাই। চরকার মধ্যে তখন সত্যের আহ্বান ছিল না, ত্যাগের প্রেরণা ছিল না, সেবার আকুতি ছিল না, প্রেমের সুর ছিল না, অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ছিল না। তাই বহু লক্ষ চরকার আবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী পতনের হাত হইতে তখন দেশকে বাঁচাইতে পারে নাই। আজ দেশে ঘরে ঘরে চরকা এখনও চলে নাই,—তবু কর্ম্মীর হাতের চরকায় আজ কি নূতন সুর লাগিয়াছে! "এক সূত্রে গাঁথিয়াছি সহস্রটি মন," —আজ সহস্র হস্তের রম্য স্পন্দনে চরকায় যে সুর জমিয়াছে, সেই সুরে দেশে নব জীবনের সঙ্গীত গীত হইতেছে। চরকা একা নয়, ব্যক্তিকে স্বীকার করিয়া, মানুষকে মর্য্যাদা দিয়া চরকা আজ বহু গ্রাম-শিল্পের মধ্যমণি। চরকা গৃহহারাকে কারখানা-ঘর হইতে গৃহে আহ্বান করিতেছে, চরকা জনগণের মনের রাস্তা খুলিয়া দিয়াছে, চরকা-কেন্দ্র দেশে নূতন ভাব ও নূতন কর্ম্মের কেন্দ্রে পরিণত হইতেছে। নামজপের মত, আলোক ও বাতাসের মত চরকা সর্ব্বসাধারণের। প্রতিযোগিতার প্রাণান্তকর পথ

হইতে চরকা সহযোগিতার আনন্দময় পথে আহ্বান করিতেছে। চরকা শোষণহীন শ্রমের প্রতীক, তাই অংহিসার দ্যোতক। যন্ত্রাসুরের পদভরে আজ মেদিনী কম্পমানা, যন্ত্রসভ্যতার অবশ্য-ম্ভাবী ভীষণ আত্মঘাতের দিন বুঝি ঘনাইয়া আসিতেছে। এই ভয়ঙ্করের পটভূমিকায় চরকার কল্যাণময়ী মূর্ত্তি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং চরকার মধ্যে যাহারা নবজীবনের গান শুনিয়াছে, তাহারা ত মিথ্যা শোনে নাই !

দুই

রাত প্রায় একটা, চারিদিক নিস্তব্ধ, আকাশে তারার মেলা। নোকুণ্ডার মাঠ ছাড়িয়া চলিলাম। শিবিরে সত্যাগ্রহীর দল গভীর নিদ্রায় অচেতন, আরও একটা দিন তাহারা একত্র বাস করিবে। নিঃশব্দে বিদায় লইবার কালে, মন বলিয়া উঠিল,—সার্থক হোক্ এই মিলন, কর্ম্মক্ষেত্রের কঠিন মাটিতে যেন এই মিলনের ফসল ফলে। পাষণ্ড মনেও দেখি প্রার্থনা জাগিল। স্তব্ধ রজনীর গভীর মায়া, অথবা আকাশে সুদূরের আহ্বান,—জানি না প্রার্থনা কে জাগাইল। তবু মনে হইল, সেই পরম ক্ষণটি যেন সত্যের আলোকে সমুজ্জ্বল, সে যেন আর সব ক্ষণ হইতে স্বতন্ত্র একটি মাহেন্দ্র ক্ষণ।

গ্রামে ও পথে

ক্রমে গ্রাম-পথ ছাড়িয়া মাঠে গিয়া পড়িলাম। গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে চলিতেছে। মেটে রাস্তা, উঁচু নীচু, খানা খোঁদল। গাড়ী উঠি ত পড়ি করিয়া যাইতেছে। পাপিয়ার তরল সুরের লহরে স্তব্ধ আকাশ কাঁপিয়া উঠিতেছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঘুম আসে, কিন্তু তার মিষ্ট আবেশটুকু না জমিতেই ভাঙ্গিয়া যায়, এমনি গাড়ীর ঝাঁকুনী। এইভাবে রাত কাটিয়া গেল। তারপর ভোরের হাওয়া, পূর্ব্বাকাশে রক্তরাগরেখা,—তারপর সূর্য্যোদয়ের সমারোহ। আন্দাজ বেলা আটটায় শ্যামবাজার গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। গরুর গাড়ীর ক্রোড় হইতে নামিয়া যখন মাটিতে পা দিলাম, তখন হাড়গুলো যেন উল্টোপাল্টা হইয়া গিয়াছে।

শ্যামবাজারে এক বন্ধুর ঘরে দুইদিন কাটিল। বন্ধুর মা বুড়া বয়সে দেশের ডাকে জেল খাটিয়াছেন। তাঁর ঘরে স্বদেশী ছেলেদের নিত্য আসা-যাওয়া। গ্রামে এখন জমিদার-প্রজায় দ্বন্দ্ব চলিতেছে। উভয় পক্ষে জিদ্ চাপিয়া ব্যাপারটা ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে এবং পীড়নটা প্রজার প্রতিনিধির উপরই হইতেছে সব চেয়ে বেশী। উভয় পক্ষের সহযোগিতায় এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমে গ্রামের সকল পাড়া দেখিলাম। অবস্থা সর্ব্বত্রই খুব শোচনীয়। তবু, দুঃখবিপদের দিনে যে দুই একজন এই হতভাগ্যদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে, তাহারা কংগ্রেসের লোক বলিয়া কংগ্রেসের উপর ইহারা আস্থাবান্। মুসলমানপাড়ায় একটি ছোট পাঠশালা-ঘরের

দোরে ছোট ছোট তালের চ্যাটা পাতা ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—

"এখানে কি হ'য়েছিল?"

"আজ্ঞে, পাঠ হ'য়েছিল।"

"কি পাঠ?"

"এই আমাদের ভাগবত-পাঠ গো।"

"কে পাঠ ক'রেছিলেন?"

"ঠাকুর মশাই এসেছিলেন, তিনিই পাঠ ক'রেছিলেন।"

বুঝিলাম, ইহাদের গুরুঠাকুর এইখানে কোরাণ পাঠ করিয়াছেন। ভাগবত অর্থে ভগবানের কথা, আর "পাঠ" জিনিষটা হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে বাঙালীর ধাতে ঠিক লাগে।

কোরাণ-পাঠের কথা এইভাবে উল্লেখ করিতে গিয়া তাহার মুখ সরল শ্রদ্ধায় দীপ্ত হইল। বুঝিলাম, বাঙলার উদার উন্মুক্ত প্রান্তরের ক্রোড়ে এই হইল খাঁটি বাঙালী মন,—কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই এই মনের অধিকারী। বাঙলার পল্লীকাব্যে, ছড়া ও গানে, বাউল ও ভাটিয়ালী সুরে, সর্ব্বত্র এই ভাবমুগ্ধ সরল মন ভবিষ্যৎ বাঙালী জাতি-গঠনের মূলধন হইয়া আছে। ইহাকে অবিকৃত রাখা এবং ইহার স্বাভাবিক বিকাশের পথ খুলিয়া দেওয়া বাঙালার স্বাধীন শিক্ষাবিধানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হইবে সন্দেহ নাই।

অপরাহ্ণ বেলায় বদনগঞ্জ যাইবার পথে মাঠখানি বড় সুন্দর দেখাইতে লাগিল। পার্শ্বে বিশাল তালদীঘি। তার উঁচু পাড়ের

উপর তালগাছের সারি, আর পাড়ের নীচে শ্মশান। মাঠের পারে, দূরে দূরে গ্রামগুলি ছবির মত দেখাইতেছে। ক্যামেরা-ধারী কোন বন্ধু সঙ্গে থাকিলে ছবি তুলিয়া লাভবান্ হইতেন সন্দেহ নাই। পড়ন্ত রৌদ্র মেঘে ঢাকা আছে, আর অফুরন্ত মেঠো হাওয়া। পথ চলায় সে কি আনন্দ! সঙ্গীকে বলিলাম, "জায়গাটা খুব ভাল, না?"

ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ, প্রকৃতির রূপের ফাঁদে মন এখানে সহজেই ধরা দেয়, কিন্তু আসলে এটা হ'ল পচা জায়গা, ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন গিয়েছে।"

"বিশ্বাস হয় না।"

"বিশ্বাস করবার জন্যে ভাদ্র-আশ্বিনে এখানে এসে থেকে দেখবেন। কবিরা ঐ কি সব দখিন হাওয়ার কাঁপনের কথা বলেন,—এখানকার ম্যালেরিয়ার কাঁপনে দেখবেন, সর্ব্বাঙ্গে একবারে অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ ফুটে উঠবে।"

ম্যালেরিয়ার দাপটের কথা ত আর নূতন কিছু নয়। তবু শুনিয়া মনটা অবসন্ন হইয়া পড়িল। সঙ্গী বলিল, "নোকুণ্ডায় * * * দাদা যখন ডাক্তারীতে বসবেন ঠিক করলেন, তার আগে আমরা কি করেছিলাম জানেন?"

"ঠিক জানি না ত।"

"আমরা স্থান-নির্ব্বাচনের জন্যে এই অঞ্চলে ঘুরেছিলাম, অর্থাৎ দ্বারকেশ্বরের পশ্চিম পারে এই দিকটায়। তারপর ম্যালেরিয়ার পীঠস্থান ব'লে নোকুণ্ডাকেই বেছে নেওয়া গেল।

কারণ দেখা গেল, সেখানে প্রায় শতকরা পঁচাশি জনের পেটে পিলে।”

কথা শুনিয়া পিলে চমকাইয়া উঠিবারই কথা! তথাপি হত-ভাগ্য দেশে ইহাই রূঢ়, কঠিন, নির্ম্মম বাস্তব। অস্বাস্থ্যের এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিবার সাহস যাঁহারা রাখেন, এমন কর্ম্মীই পল্লী-অঞ্চলে কংগ্রেসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন।

এই সূত্রে হুগলী জেলার এক শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীর “মেডিকেল টোলের” কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল, তাঁদের তরুণ বয়সের স্বপ্ন, মনে পড়িল, সেই আত্মভোলা আদর্শবাদীর দল, যাঁহারা ভারত-বর্ষের স্বাধীনতার সাধনকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর জীবনে কত কি ঘটিয়া গেল। অবিচ্ছেদে নিঃস্বার্থ কর্ম্মের পথ ধরিয়া থাকিবার পর, মহাত্মাজী যখন জাতীয় আন্দোলনের গতি দিকে দিকে গ্রামের অভিমুখে প্রসারিত করিয়া দিলেন, তখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় একান্ত বিশ্বাসবান্ এই কর্ম্মী সহরের মায়া কাটাইয়া গ্রামে গিয়া বসিলেন। তখন দেশের স্বাস্থ্য-সমস্যা ইঁহার চিন্তার বিষয় হইল, কারণ ইনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। “মেডিকেল মিশন” গঠনের স্বপ্ন দেখিয়া, ইনি গ্রামের ছাত্র লইয়া, তাহাদের সকল ব্যয়ভার বহন করিয়া আপন স্নেহনীড়ে তাহাদের আশ্রয় দিয়া, আপন চিকিৎসা-বিদ্যা তাহাদিগকে দান করিলেন। এই মেডিকেল টোলের কথাই বলিতেছিলাম। নোকুণ্ডার ম্যালেরিয়ার মধ্যে যিনি বাসা বাঁধিয়া

আছেন, তিনি এই মেডিকেল টৌলেরই ছাত্র। ছাত্রদের অপর অনেকেই আপন আপন স্বার্থ-সেবায় মগ্ন হইয়াছে। তথাপি অভিজ্ঞ ও একনিষ্ঠ কর্ম্মীর কল্যাণচেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। যৌবনের স্বপ্নকে এমন করিয়াই দিনে দিনে বাস্তবের মধ্যে রূপ দিতে হয়। আদর্শবাদের সার্থকতা এইখানে।

তিন

একদিন সকালবেলা আমরা জয়রামবাটী মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জয়রামবাটী বাঁকুড়া জেলার ভিতর। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সহধর্ম্মিণী সারদেশ্বরী মাতার জন্মস্থান বলিয়া এই গ্রামের খ্যাতি। মঠের অধ্যক্ষ মহাশয় মিষ্টভাষণে অভ্যর্থনা করিয়া আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। আমরা মঠের অতিথি হইলাম। মন্দিরের মধ্যে মাতাজীর প্রতিকৃতিকে প্রণাম করিয়া আমরা মঠের এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিলাম। স্থান তত প্রশস্ত নয়, তবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু মন্দিরের গঠন দেখিয়া মন একেবারে দমিয়া গেল। এই অঞ্চলে সর্ব্বত্রই নানা ধরণের প্রাচীন মন্দির একান্ত অযত্নের মধ্যে এখনও দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের গঠন যেমন সুঠাম, কারুকার্য্যও তেমনি মনোরম।

সুতরাং নিদর্শনের অভাব ছিল না। তথাপি মাতৃমন্দির-নির্ম্মাণে এই জালা-উপুড়-করা ঢং কোথা হইতে আমদানী করা হইল ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এই শ্রীহীন পরিকল্পনা শুধু আমাদের রূপদৃষ্টিকে পীড়া দেয় না, নির্ম্মাতাদের সৌন্দর্য্যবোধকে ধিকৃত করে। কিন্তু দুঃখ করিয়া কি হইবে? সকল ক্ষেত্রেই আমাদের মনের পরাজয় ঘটিয়াছে, তাই শিল্পের রম্য নিদর্শন কাছে থাকিলেও আমাদের চোখে পড়ে না।

ছোট একখানি মাঠ পার হইয়া আমোদর নদীর তীরে আসা গেল। ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া গিয়াছে। একদিকে উঁচু পাড়ের উপর একটি বটগাছ, ছায়া তার জলে পড়িয়াছে। স্নান করিবার জন্য আমরা সেইখানে নামিয়া পড়িলাম। কি আরামের সে অবগাহন,—মাতৃস্নেহের নিবিড় স্পর্শের মত! স্নান সারিয়া মঠে না ফিরিতেই দেখি এক তকমা-ধারী আরদালী কাহার আগমন ঘোষণা করিতেছে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই এক বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারীর আবির্ভাব,—সঙ্গে পরিজন। মঠে তখন সে কি চাঞ্চল্য! কি ব্যস্ততা,—যতক্ষণ তিনি ছিলেন। বলিতে কি, এই সময়ে মঠের ভক্তজনের চিত্তের সমতার এই অতি ব্যতিক্রম আমাদের অস্বস্তির কারণ হইয়াছিল।

অপরাহ্লে কামারপুকুর অভিমুখে রওনা হইলাম। মাঠের মাঝে এক জায়গায় অনেকগুলি বটগাছ। শুনিলাম, হাটের পথে এই বটতলায় গদাধর ঠাকুর,—আমাদের পরমহংসদেব—বাল্য-কালে ধ্যানে বসিতেন। অপরিমেয় যাঁর আধ্যাত্মিক সম্পদ, সেই

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষকে স্মরণ করিতে করিতে ক্রমে আমরা কামারপুকুর গ্রামের একটি ছোট গৃহস্থ বাড়ীর দ্বারে আসিয়া পৌছিলাম। চৌকাঠের ধুলি মাথায় তুলিয়া লইয়া আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলাম। বাঁদিকে অপ্রশস্ত ঢেঁকিশালের মাটিতে কয়েকটা ফুল পড়িয়াছিল। এই স্থানে, "এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে" মানবজাতির মিলনের অধ্যাত্মক্ষেত্র রচিত হইয়া আছে, —কেননা, সর্ব্বধর্ম্মে সমদৃষ্টি ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই স্থানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। মন্দির নাই, স্মৃতিচিহ্ন নাই, নিরাভরণ এই ভূমিটুকুর উপর শুধু কয়টি ফুল সেই মহাস্থানকে নির্দ্দেশ করিতেছে। খুব ভাল লাগিল; বিমুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। রামকৃষ্ণদেবের নামে মঠ হইয়াছে, সেবাশ্রম হইয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের বাণী পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রচার করিয়াছেন, দেশ-বিদেশের কত মনীষী পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক সাধনার কথা অলোচনা করিয়া বুঝাইয়াছেন,—তবু মঠ-মন্দির-সেবাশ্রমে তিনি বাঁধা পড়েন নাই, আলোচনা-বিচারে নিঃশেষ হন নাই। তারই নিদর্শনস্বরূপ তাঁর এই জন্মস্থানটি আজও মানুষের স্থূল হস্তাবলেপ হইতে যেন মুক্ত আছে,—তাঁর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের আরও কত বিপুল সম্ভাবনা এই মুক্ত স্থানটুকুতে যেন স্তম্ভিত হইয়া আছে!

বাহিরে আসিয়া একে একে হালদার পুষ্করিণী, লালাবাবুর পুষ্করিণী, ভূতির খাল প্রভৃতি পরমহংসদেবের বাল্যলীলার স্থানগুলি দেখিয়া লইলাম। বটের ঝুরিতে ঝুলিয়া যেখানে তিনি দোল

খাইতেন, সেইস্থানে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। তখন দিবসের শেষ প্রণামটির মত পৃথিবীর বক্ষে সন্ধ্যা নামিয়াছে।

ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। আমরা নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে কবিরাজ-বন্ধুর বাটীতে আশ্রয় লইলাম। মধ্যরাত্রে পরমানন্দে গরুর গাড়ী চড়িয়া রওনা হইয়া পড়িলাম। ভোরবেলা আরামবাগ মহকুমা কংগ্রেস অফিসে আসিয়া হাজির। অফিসের উপর কংগ্রেসের ধ্বজা উড়িতেছে। স্বয়ং সম্পাদক অভ্যর্থনা করিলেন,—হাসি হাসি মুখ, মজবুত শরীর, মজবুত মন। তিনি কর্ম্মব্যস্ত রহিলেন, আর আমরা হাত পা ছড়াইয়া একবার শুইয়া পড়িলাম। কংগ্রেস অফিস বলিতে ভুল বুঝিবার কিছু নাই। গবর্ণমেণ্ট অফিসে মোটা মাহিনার কর্ম্মচারীরা চেয়ার-টেবিলে বসিয়া মোটা মোটা ফাইল লেখে, তকমাধারী চাপরাশী-আরদালীর দল ছোটা-ছুটি করে, বিজলী বাতি জ্বলে, পাখা চলে, আর সঙ্গে রাজ্য চলে। কংগ্রেস অফিসের স্যাঁৎসেঁতে ঘরে বিনা মাহিনার কর্ম্মীরা খাইয়া অথবা না খাইয়া কংগ্রেসের কাজ চালায় এবং স্বরাজ-গঠনের স্বপ্ন দেখে। তাই এখানকার আসবাবের মধ্যে সবে ধন ঐ ছেঁড়া মাদুরখানাও সরকারের বক্রদৃষ্টি এড়ায় না। কয়েকদিন পরে এ হেন নিজেদের আস্তানায় ফিরিয়া একটা হাল্কা আনন্দে মন ভরিল। যথানিয়মে ও যথাসময়ে অর্থাৎ নিয়ম ও সময়ের একটুও পরোয়া না করিয়া স্নানাহার শেষ হইল। তরকারিটা ঝোল, কি দালনা, কি সুক্ত, কিছুই বুঝা গেল না, তাই আজও ভোলা গেল না। অফিস বেশ গুলজার! কেহ কংগ্রেস কমিটিগুলি পুনর্গঠনের ব্যবস্থা

লইয়া ব্যস্ত, কেহ বা হিসাব করিতেছে, কেহ বিবরণী লিখিতেছে, কোথাও সুতাকাটা হইতেছে, কেহ কাগজপত্রের উই ঝাড়িতেছে, কেহ বা তারই মাঝে দিব্য আরামে একটু ঘুমাইয়া লইতেছে। ইহারই মধ্যে আবার গ্রামের লোক দুই-একজন জমিদারের বে-আইনী আদায় বা অন্য কোন অত্যাচারের নালিশ করিতে আসিয়াছে,—কংগ্রেস তাহাদের ভরসা। আমরা ভ্রাম্যমান্, সুতরাং উপস্থিত বিনা কাজের কাজী। তাই মনে করিলাম, আমাদের এই কাজ, গল্প, তর্ক ও আলোচনার ঘাঁটিতে,—এই কড়া চা ও মুড়ি-চর্ব্বণের জগন্নাথক্ষেত্রে,—ঘরের লোকের কাছে অনাবশ্যক, বাইরের লোকের চোখে অদ্ভুত এবং বিজ্ঞের বিচারে অর্ব্বাচীন এই না-গৃহী-না-বৈরাগীর আখড়ায়,—দেশের নব্যতন্ত্রের এই পীঠস্থানে, না হয় পরমানন্দে দুই একটা দিন কাটাইয়া যাই। কিন্তু হইয়া উঠিল না। হুকুম হইল মবারকপুর যাইতে হইবে। তথাস্তু,—বাহির হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে খাঁ সাহেব। ইনি সীমান্ত প্রদেশের খুদাই খিদ্‌মদ্‌গার দলে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। খুব হাসিখুসী আমুদে লোক।

চার

মবারকপুরে আমরা *** সেখের অতিথি। বাহির বাড়ীতে বসিয়া আছি। সুমুখে ফাঁকা চাষের মাঠ। অদূরে দ্বারকেশ্বর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। খাঁ সাহেব দুই এক জন সাথী লইয়া নামাজ পড়িতেছেন। তাঁর মুখে প্রার্থনার সুরে আরবী মন্ত্রের উচ্চারণ বড় মিষ্ট লাগিতেছে। এক বর্ণও বুঝিতেছি না, তবু প্রাণ স্পর্শ করিতেছে। প্রার্থনার ভাষা দেশে দেশে ভিন্ন, কিন্তু তার সুর ও ভঙ্গী সর্ব্বত্রই এক, তার অন্তরের কথা ত অভিন্ন। তাই কখনও প্রণামের ভঙ্গীতে, কখনও নতজানু হইয়া, কখনও শান্তভাবে দাঁড়াইয়া, বন্দনার সরল ছন্দে প্রার্থনার বিভিন্ন অঙ্গের সুমধুর প্রকাশ উন্মুক্ত প্রান্তরের ক্রোড়ে আমাদের সেই রাত্রির আশ্রয়কে অভিনব একটি ঐশ্বর্য্য দান করিল।

নামাজের পর কথাবার্ত্তা। বন্ধু বলিলেন, "সেখ মশাই, নামাজ বড় ভাল লাগলো।"

"আজ্ঞে তা ত বটেই। আপনাদের পূজো আর আমাদের নামাজ কি আলাদা গা। যে আল্লা সেই ত ভগবান্। তবে হাঁ, তোমাদের ধরণটা এক, আর আমাদের ধরণটা হ'ল আর এক।"

"তা হ'লে আসলে তফাৎ নেই,—দুইই এক?"

"বটেই ত, ভগবান্ কি দুটো হয়?"

"আমাদের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কি বলতেন, জানেন?"

"তাঁর নামটা যেন শুনেছি কর্ত্তা, কিন্তু কি বলতেন তা ত জানি না।"

"তিনি বলতেন,—ওরে, আমি হিন্দু হ'য়ে মন্দিরে মা মা ব'লে ডেকেছি, মুসলমানের বেশে পশ্চিম মুখে নামাজ পড়েছি, শিখদের 'অলখ নিরঞ্জনের' কাছে হাতযোড় ক'রে দাঁড়িয়েছি, খৃষ্টানের "পিতাহসি লোকস্য চরাচরস্য"—তাঁরও চরণে শরণ নিয়েছি। দেখেছি, সকল পথের শেষে তিনিই দাঁড়িয়ে আছেন, যিনি সর্ব্বদেশে সকলের আশ্রয়,—সর্ব্বকালে।"

"এ ত তা হ'লে খুব জ্ঞানের কথা হ'ল দাদা!"

"জ্ঞানের কথা বটে, আবার প্রাণের কথাও বটে। আর কবীর, দাদু, নানক,—এঁরা সব কি বলতেন জানেন?"

"তাঁরা আবার কারা গো?"

"এই আমাদেরই দেশের গো। তাঁরা সন্ন্যাসী-ফকির, ভক্তের চূড়ামণি। হিন্দু-মুসলমান সমানে তাঁদের শ্রদ্ধা করে। তাঁরা বলতেন,—রাম-রহিমে ভেদ নেই।"

"বটে কথাই ত দাদা।"

"কবীর যখন দেহ রাখলেন, তখন ভারী একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল।"

"কি রকম?"

"হিন্দু আর মুসলমান সকলেই ছিল তাঁর ভক্ত। তারা কবীরের শবদেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করলে। হিন্দুরা বললে দাহ করবো, মুসলমান বললে কবর দেবো।"

"অ্যাঁ, কি হ'ল তারপর ?"

"সে বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। শবের উপর একখানা চাদর ঢাকা ছিল। সকলে মিলে তখন চাদরখানা তুলে দেখে, তার ভেতর কবীরের দেহ নেই, আছে রাশীকৃত ফুল। তখন সেই ফুলের রাশির কতকগুলো নিয়ে হিন্দুরা করলে দাহ, আর কতক-গুলো মুসলমানেরা দিলে কবর। তারপর সকলে গলা মিলিয়ে গুরুজীর জয়ধ্বনি ক'রে উঠলো।"

"তারপর ?"

"তারপর আকাশ থেকে কবীর তাদের আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন,—ভগবানের নাম নিয়ে তোমরা এমনি ক'রে মিলে যাও জীবনের সকল ক্ষেত্রে।"

"দেখ ত দাদা, সাধু-ফকিররা কি আর হিন্দু-মুসলমানে তফাৎ করেন ? তাঁদের হ'ল সবারই উপর সমান ভালবাসা।"

"সেই ভালবাসাই ত মরণের পর ফুল হ'য়ে ফুটে উঠেছিল।"

"কতই আছে দাদা এই ভারতে !"

এইবার খাওয়া-দাওয়ার ডাক পড়িল। মুসলমানের ঘরে আমরা কয়জন হিন্দু অতিথি, গৃহস্থ ভারি খুসী। খুব যত্ন করিয়া আমাদের আহার করাইলেন। আহারান্তে আবার গল্প সুরু হইল। সেখ মহাশয় বলিলেন, "আমাদের কি জান দাদা,—আমরা হলুম চাষীবাসী মুখ্য্যু লোক, বই-কেতাবের ধার ধারি না। তবু আপনারা একদিন এসেছ গো, কত ভাল কথা শোনা গেল। হাঁ, বলি কথা,—ছেলেটাকে ইস্কুলে দিয়েছি, বছর

বছর এক আঁচলা টাকা খরচ হবে। ছাই-রাই কি যে শিখবে, তা ত জানি না।”

“কেন ?”

“এই দেখ না আমাদের * * *। মাদ্রাসায় লেখাপড়া শিখে এসে ঘরে ব’সে আছে। চাকরী পায় না, এদিকে লাঙ্গল ধরতে লজ্জা পায়। যেন দু’য়ের বার।”

“তা চাষের কাজে লজ্জা কেন ?”

“হায়, হায়! লেখাপড়া শিখে বাবু হ’য়েছে যে। মেহনতের কাজ আর করতে পারে ? আবার চাষের কাজেও কি সুখ আছে, ম’শায়। হাজা-শুকো আছে। ফসল দু আনা হোক, আর দশ আনাই হোক, জমিদার ছাড়বে না, তার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হবে। নহিলে সে অনেক লাঞ্ছনা। তারপর রোগ, —ম্যালেরিয়ার জ্বালা। চাষীর সুখ কোথাও নেই। এমনি ক’রে যে ক’টা দিন কেটে যায়।”

কথাবার্ত্তায় রাত্রি অনেক হইয়া গেল। আমরা শুইয়া পড়িলাম। মুসলমান চাষীর ঘরে অতিথিরূপে রাত্রিবাস এই আমাদের প্রথম। মনে মনে এই অভিজ্ঞতাটুকুর মূল্য নিরূপণ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রির গুমোটে বড় অস্বস্তি-বোধ হইতেছিল। শেষে, ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগিল, —কি মধুর! সে যেন বন্ধুর মুখের হাসি, সব গ্লানি ঘুচাইয়া দিল। তারপর যথারীতি সেলাম-নমস্কারের পালা সারিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

মাঠের পথে সকাল বেলাকার সোনার আলো। পথ চলিতে চলিতে বুঝিলাম, গত রাত্রির কথাবার্তার সুর তখনও মনে লাগিয়া আছে। এই মুসলমানেরা আমাদের বাঙলার আধখানা, অথচ ইহাদের সম্বন্ধে আমরা কত কম জানি। ইহাদের জীবন-যাত্রার আলেখ্য তেমন করিয়া কোন পুস্তকে দেখি না। সে চিত্র যে আজ জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরা চাই,—কালের এই ইঙ্গিত মনীষী শরৎচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু চিত্রণে হাত দিবার পূর্ব্বেই তিনি চিরবিদায় লইলেন। ইহারা বাঙলা বলে, বাঙলায় ভাবে, বাঙলার মাটিতে হাঁটে, বাঙলার ক্ষেতে ফসল ফলায়, বাঙলার আকাশ বাতাস ইহাদের প্রাণে বাঁশী বাজায়, ইহাদের দেহে বাঙলা, রক্তে বাঙলা, মনে বাঙলার সুর। তথাপি ইহাদের সম্বন্ধে কৌতূহল আমাদের ঠিকমত জাগে না। সামাজিক আদান-প্রদান আজও আমাদের মধ্যে একরূপ বন্ধ। অথচ, বাঙলায় তথা ভারতে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া জাতিগঠন হইবে, ইহার স্বপ্ন আমরা দেখিতেছি। কিন্তু প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদের প্রাচীর উঁচু হইয়া আছে, তাহাকে অপসারিত না করিলে জাতিগঠনের এই স্বপ্ন সার্থক হইবে কোন্ পথে? ইতিহাস হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাঙ্গনের জায়গাটি দেখাইয়া দেয়, মিলনের পথের নির্দ্দেশ করিতে সে কুণ্ঠায় কাতর,—কারণ তার রচনা পরের হাতে, বিদেশী শাসনের প্রয়োজনে। প্রাণের প্রয়োজনে আপন হাতে রচিত হইলে, ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে মিলনের রাজপথ পাওয়া যাইত। প্রাণের তলে

তলে মিলন-রাগিণীর গুঞ্জন না থাকিলে, দেশের হৃদয় হইতে ভক্ত কবীর শতদলের মত ফুটিয়া উঠিত না, চিত্রে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যে হিন্দু-মুসলমানের দুই ধারা মিলিয়া গিয়া ভারতবর্ষীয় ধারার উৎপত্তি হইত না, সন্ন্যাসী-ফকির একই বৈরাগ্যের পথে আপনাদের রিক্ত করিয়া দিয়া অব্যক্তের সন্ধানে ফিরিত না, অরূপের প্রেমে মজিত না। মিলনের পথে আজ বাধা যেন দুরতিক্রমণীয়। রাজনীতিক্ষেত্রে আজ অদূরদর্শী নেতারা প্রভুত্বের মোহে ইহাদের উভয়কেই ভুল পথ দেখাইতেছে। তথাপি এই ব্যর্থতার মাঝে মিলনের সত্যপথের সন্ধান করিতেই হইবে প্রাণের প্রয়োজনে এবং প্রেমের আহ্বানে।

পাঁচ

সালেপুর গ্রামে এক ডাক্তারখানায় বসিয়া আছি। এইখানে কংগ্রেসী ইউনিয়ন বোর্ডেরও অফিস। মুড়ি ও কাঁচা লঙ্কা-সহযোগে চা চলিতেছে। লঙ্কার ঝাল মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তায় আসিয়া মিশিতেছে। একজন বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ মশাই, অস্পৃশ্যতা-পরিহারের কথা ত বলছেন, কিন্তু তাই ব'লে কি হিন্দুয়ানী উঠিয়ে দিতে হবে?"

বন্ধু বলিলেন, "ছুঁৎমার্গ ছাড়্‌লে যদি হিন্দুয়ানী উঠে যায়

ত এমন হিন্দুয়ানী উঠে যাওয়াই ভাল। তা'তে হিন্দুধর্ম্ম বাঁচবে।"

"হিন্দুধর্ম্মের ত খুব পাণ্ডা হয়েছেন দেখছি। কংগ্রেস করছেন করুন, ধর্ম্মের আপনারা কি জানে বলুন ত?"

"আজ্ঞে কিছু না। ধর্ম্মস্য তত্ত্বম্ নিহিতম্ গুহায়াম্,—আপনারা সন্ধানী লোক, আপনারা হয়ত খবর রাখেন।"

ঘরের এক ধারে পরামাণিক এক বামুন ঠাকুরকে কামাইতেছে এবং আড়ে চাহিয়া আমাদের কথাবার্ত্তার তারিফ করিতেছে। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "যাই বলেন মশায়, আচার-বিচার ঘুচিয়ে দিয়ে জাত-জন্ম খোয়াতে পারবো না,—এতে আপনাদের 'স্বদেশী' চলুক আর নাই চলুক।"

বন্ধু জবাব দিলেন, "ভায়া, আমাদের 'স্বদেশী' যদি অচল হয়, তবে তোমাদেরও আর বেশীদিন সচল থাকতে হবে না।"

স্বদেশীকে অচল করিয়া দিয়াও হিন্দুয়ানী বজায় রাখিবে, হিন্দুয়ানীর উপর ইহাদের এতই টান। অথচ এই হিন্দুয়ানীর মধ্যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের যে ছিটাফোঁটাও অবশিষ্ট নাই, সে কথা ইহারা কড় কেহ বুঝে না। ইহারা জানে না যে আজ একমাত্র 'স্বদেশীর' স্পর্শ পাইয়াই হিন্দুয়ানীর এই শূন্যপাত্র ধর্ম্মের সুধা-ধারায় পূর্ণ হইতে পারে। মঠ-মন্দির, পূজা-পার্ব্বণ, মন্ত্র-তন্ত্র, ব্রত-উপবাস, স্নান-দান, আচার-বিচার সর্ব্বত্রই ছুঁৎমার্গের যূপ-কাষ্ঠে হিন্দু প্রতিনিয়ত বলি পড়িতেছে। মন্দিরে প্রবেশ নাই, পূজার দালানে উঠিবে না, মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না, দানে অধিকার

নাই, জলাশয় হইতে তৃষ্ণার জল লইবে না। দেবতার প্রসাদগ্রহণেও পংক্তিতে বসিবে না,—এক বর্ণ অন্য বর্ণের প্রতি নিষেধের গণ্ডী টানিয়া কেবলই বলিতেছে না, না, না,—ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না,—ছুঁইলেই জাতিধর্ম্ম, ইহকাল-পরকাল, সর্ব্বস্ব যাইবে। ইহারা আপনার জনকে আঘাতই করে, আশ্রয় দেয় না, ইহারা ঘৃণা করিয়া সুখ পায়, ভালবাসিতে জানে না। এমনি করিয়া হিন্দুকে বাদ দিয়া যে হিন্দুয়ানী তাহার বিষে সমাজ আজ জর্জ্জরিত, শতধা ভিন্ন, মরণোন্মুখ। ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া ছুঁৎমার্গ রাক্ষসটা হিন্দুয়ানী নামে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজকে নিত্য যমালয়ের পথে পাঠাইয়া দিতেছে, আর মোহগ্রস্ত প্রতারিত আমরা ধর্ম্ম-পালনের নামে এই রাক্ষসটাকেই নিত্য পুষিতেছি। অদৃষ্টের পরিহাস আর কাহাকে বলে! ছত্রিশ জাতিতে বিভক্ত এই হিন্দুসমাজ, প্রত্যেক জাতির মধ্যে আবার উপজাতি, উপজাতির আবার তস্য উপজাতি। মনে আমাদের হিন্দুয়ানীর অন্য যে ভাল কথাই থাকুক না কেন, আসল কথাটা হইল আমাকে ছুঁয়ো না। ছুঁৎমার্গের দগ্ধ শলাকায় বিদ্ধ হইয়া আমরা ছিন্নভিন্ন, ক্ষীয়মান। আমাদের শিয়রে শমন, তথাপি হুঁস্ নাই।

বন্ধু বলিলেন, "আচ্ছা পরামাণিক ভায়া, তুমি মুচির ক্ষৌরকার্য্য করবে?"

পরামাণিক বলিল, "আজ্ঞে না।"

"কেন নয়?"

"আজ্ঞে সে যে মুচি।"

"সে যদি খৃষ্টান হয়, তা'হলে ত করবে ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"যদি মুসলমান হয়, তা'হলে ?"

"আজ্ঞে হাঁ, করবো।"

"কিন্তু সে যদি মুচি-হিন্দুই থাকে, তা'হলে পারবে না ?"

"আজ্ঞে না।—কথা কি জানেন, হিন্দুয়ানী ত মানতে হবে।"

"আচ্ছা, মুচির বামুন আছে ?"

"কে বললে নেই ? তাদের ঠাকুরপূজো ত বামুনেই করে।"

"তা'হলে হিন্দু সমাজে বড় জোর বামুন দিয়ে তাদের ঠাকুরপূজো পর্য্যন্ত চলতে পারে, কিন্তু নাপিত দিয়ে দাড়ি-কামানো ?—অতদূর কিছুতেই চলবে না।"

"হায়, হায়! ঠাকুর-পূজো আর দাড়ি-কামানো কি এক হোলো গা ?"

"কে বললে এক ? দাড়ি-কামানো বড় হোলো!"

"আপনি ঠাট্টা করছেন। কিন্তু হিন্দু সমাজে থাকতে হ'লে হিন্দুয়ানী ছাড়ি কি করে বলুন ?"

"ঠাট্টাও করছি না ভাই, সমাজ ত্যাগ করতেও বলছি না।"

"তবে ?"

"ভাবছি নিজেদের দুঃখের কথা। আচ্ছা ভাই, মুচি-হিন্দু কি মানুষ নয়, তোমার আমার মত ?"

পরামাণিকের ভিতরের মানুষ এইবার সাড়া দিল। একটু ব্যথিত হইয়াই সে বলিল, "দেখুন, ক্ষৌরী করাই আমাদের

কাজ। মুচির ক্ষৌরীও স্বচ্ছন্দে করতে পারি, যদি বামুন ঠাকুর হুকুম দেন।”

তখন জিজ্ঞাসুনেত্রে আমরা বামুনঠাকুরের মুখের দিকে চাহিলাম। বন্ধু বলিলেন, “কেমন, দেবেন হুকুম ঠাকুর মশাই ?”

ঠাকুর মশাই বলিলেন, “আমি হুকুম দেবার কে ?”

“কেন, আপনারা হ’লেন সমাজপতি।”

ঠাকুর মহাশয় নরম হইয়া বলিলেন, “কথা কি জানেন, সকলের যদি মত হয়, তবে আমার আর অমত কিসের ? একা মত দিয়ে ত আর আমি সমাজে একঘরে হ’য়ে থাকতে পারি না।”

ধর্ম্মকে ফাঁকি দিয়া এই ধার্ম্মিকতা, মানবতাকে বাদ দিয়া এই সমাজ-বিধি, আত্মীয়কে পর করিয়া এই আত্মপ্রসাদ,—কার্য্যতঃ এই হইল হিন্দুর আসল হিন্দুয়ানী। ছুঁৎমার্গের এই গলিত শবটা বহন করিয়া হিন্দুসমাজ অপবিত্রতার মহাপঙ্কে ডুবিয়াছে। তার মুক্তিস্নান হইবে কবে ?

মনে পড়িয়া গেল এই অঞ্চলের একটা ঘটনার কথা। দুই বামুন, তারা খুব বন্ধু,—যাজকতা করে, একজন সদ্‌গোপের, আর একজন মাহিষ্যের। একদা গাঁজার কল্কে লইয়া তাহাদের বিবাদ বাধিয়া গেল। গাঁজায় জোর দম দিয়া সদ্‌গোপের বামুন আদর করিয়া তাহার বন্ধুর হাতে গাঁজার কল্কেটী দিল, কিন্তু কল্কের ন্যাকড়াটী দিল না। হিন্দু সমাজে সদ্‌গোপ মাহিষ্যের চেয়ে উঁচু জাত। অতএব সদ্‌গোপের বামুন এমনি করিয়া মাহিষ্যের বামুনের কাছে হিন্দুয়ানী বজায় রাখিল। তাহার

এই এক দফা হিন্দুয়ানীর জবাবে মাহিষ্যের বামুন হিন্দুয়ানীর মাত্রা চড়াইয়া দিল। মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা হইত এই দুই জাতির একই সঙ্গে। কিন্তু গাঁজার কল্কের ন্যাকড়া না পাওয়ায় মাহিষ্যের ব্রাহ্মণের ঘোর অপমান হইয়াছে। সুতরাং মাহিষ্যরা এই একসাথে গৌরাঙ্গের পূজা বন্ধ করিয়া দিয়া, তাহাদের ব্রাহ্মণের মান রাখিবার সঙ্গে বাহাদুরী করিয়াই হিন্দুয়ানী বজায় রাখিল। তারপর যাহা হইবার তাহাই হইল,—অর্থাৎ উভয় পক্ষে রাগ, বিদ্বেষ, গালিবর্ষণ, দলাদলি প্রভৃতি পরম উপভোগ্য ব্যাপার। ভক্তদের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মাচরণ দেখিয়া স্বয়ং গৌরাঙ্গদেব মন্দিরমধ্যে ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঠ হইয়া গেলেন!

এইরূপ কত শত, কত শত সহস্র লজ্জাকর হীন ব্যাপার হিন্দুয়ানী নামে প্রতিদিন, অনুক্ষণ হিন্দুসমাজের মর্ম্ম টানিয়া ছিঁড়িতেছে, কে তাহার হিসাব রাখে?

কিছুক্ষণ পরে বামুন ঠাকুর আবার কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, "বেশ ত, ছুঁৎমার্গটা যেন খারাপই হ'ল,—তবুও হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি এই ছত্রিশ জাতের এত টান কেন?"

বন্ধু বলিলেন, "এর জবাব ত খুব সোজা, ঠাকুর মশাই। হিন্দুধর্ম্ম টানে ব'লেই তার প্রতি এদের প্রাণের টান, কিন্তু ছুঁৎমার্গের প্রতি নয়। হিন্দুকে বাদ দিয়ে যে হিন্দুয়ানী, সেটা তাদের আঘাত করে, অপমান করে, লজ্জা দেয়। যে মারে, অসহায়ের সে গা-সহা হ'য়ে থাকতে পারে, কিন্তু ভালবাসা পেতে পারে না।"

"কিন্তু আমার কথার জবাব ত পেলুম না। সমাজে ছুঁৎমার্গই যেন আসলে হিন্দুধর্ম্মের স্থান জুড়ে বসেছে। তা হ'লে হিন্দু-ধর্ম্মের সঙ্গে ছুঁৎমার্গও ত তাদের টানছে।"

"বাহিরের সমাজে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু সেটা বুঝবার ভুল। হিন্দুর হৃদয়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মেরই আসন পাতা আছে। প্রাণের টান সেইখানে, সেইখানেই হিন্দুর বুক এখনও মজবুত,—নহিলে অস্পৃশ্যতার পাষাণভারে এতদিন তা চূর্ণ হ'য়ে ধূলোয় মিশে যেতো। সেই হিন্দুধর্ম্ম একান্ত উদার। সে একটা যুগ-যুগ-বাহিত সাধনার ধারা, বহু যুগের সঞ্চিত অপূর্ব্ব সংস্কৃতি। সুবিশাল এবং সুগভীর ব'লে তার সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করা চলে না। কিন্তু সে-ই আমাদের টানে। ছুঁৎমার্গ প্রতিনিয়ত আমাদের মারচে, আর সে সঞ্জীবনী সুধা দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে তুলছে। হিমালয় থেকে হরপার্ব্বতী সেই সুধাধারা ঢেলে দিচ্ছেন ভারত-বর্ষের বুকের উপর। সেই সুধাধারা আমাদের স্পর্শ করছে গীতা ও উপনিষদের বাণীর মধ্য দিয়ে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের লীলার মধ্য দিয়ে, রামায়ণ ও মহাভারতের কথার মধ্য দিয়ে, বুদ্ধ ও শঙ্করের সাধনার মধ্য দিয়ে। তারই প্রেম বহন করেছেন নানক, চৈতন্য, কবীর, দাদু, রামদাস। সেই ধারায় অবগাহন ক'রে রামকৃষ্ণদেব ভারতে মহামানবের মিলনের অধ্যাত্মক্ষেত্র রচনা করেছেন, বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ ভারতে তথা জগতে তারই পরিবেশন করছেন। হিন্দুর প্রাণের প্রাণ সেইখানে।"

"তা হ'লে ছুঁৎমার্গের সঙ্গে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের কোন সম্পর্ক, নেই ?"

"কিচ্ছু না—ওটা ছদ্মবেশ। ছদ্মবেশটা খসিয়ে দিলেই ওর ভয়ঙ্কর রাক্ষস-মূর্ত্তিটা প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। তখন থেকেই ওর মরণ স্বরু হবে।"

"ছদ্মবেশটা খসিয়ে দেবে কে ?"

"এই আমাদের 'স্বদেশী'। স্বদেশী মানে দেশকে চেনা, বোঝা, ভালবাসা,—একনিষ্ঠ হ'য়ে দেশের সেবা করা, দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণপাত করা, দেশের সমাজকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করা।"

"স্বদেশী মানে তবে স্বধু চরকা নয় ?"

"তা ত বটেই। স্বদেশী মানে চরকা, গ্রামশিল্প, সাধুশ্রম,—স্বদেশী মানে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে অস্বাস্থ্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারের মধ্যে নতুন আলোকপাত, নতুন কর্ম্মরচনা,—স্বদেশী মানে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ। গৌরাঙ্গদেব আচণ্ডালে হরিনাম দিয়েছিলেন। সেই প্রেমেই স্বদেশীর জন্ম। আপামর সাধারণের কল্যাণ-সাধনই হ'ল স্বদেশীর ধর্ম্ম। এই স্বদেশী যত প্রবল হবে, ছুঁৎমার্গের ছদ্মবেশ ততই দিকে দিকে খ'সে পড়বে। তখন হিন্দু সমাজ নতুন করে বাঁচবে, আর হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সত্যপথও খুলে যাবে।"

ছন্ম

অপরাহ্ণের আলো ম্লান হইয়া আসিতেছে, আকাশের রংএ কেমন একটা প্রশান্ত, উদাস ভাব। দ্বারকেশ্বরের নীল জল কৃষ্ণাভ ও স্থির। প্রকৃতির সেই স্তিমিত প্রসন্নতায় সন্ধ্যা-বরণের গীতি-গুঞ্জন জাগিতেছে। নদীর বাঁধের উপর আমরা কয়টি মানুষ পথ চলিতেছি। বন্ধু বলিতে লাগিলেন, "আমাদের বিড়ম্বনা কি কম? নতুন পথে পা বাড়াবার জো নেই, সমাজে একঘরে হ'য়ে থাকবার ভয়ে সকলেই আড়ষ্ট। তাই মুচির ক্ষৌরীর কথা নিয়ে বামুন ঠাকুর যখন বললেন,—'সকলের যদি মত হয়, তবে আমার আর অমত কিসের?'—তখন এই কথাই ভাবতে লাগলুম যে এই 'সকলে' কে, এই 'সকলে' কোথায়?"

আমাদের মধ্যে উৎসাহী এক গ্রামবাসী বলিয়া উঠিল, "কেন, তারা সমাজের লোক, সমাজের মধ্যেই রয়েছে।"

"তা ত বুঝলুম,—সমাজের লোক, সমাজ ছাড়া আর থাকবে কোথায়? কিন্তু এই যে সমাজের লোক, এই যে সমষ্টি, এই 'সকলে'—এরা ত শুধু পুরাতনকেই বহন ক'রে নিয়ে চলেছে, চলতি হিন্দুয়ানীর এরা ধারক, ছুঁৎমার্গের এরা বাহক। এদের কাছে ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে নালিশ চলবে কি ক'রে?"

"কেন চলবে না? পুরাতন প্রথা মেনে চলাই যেন এদের অভ্যাস। কিন্তু তাই ব'লে কি এদের হৃদয় নেই?"

"বাস্ রে, হৃদয় নেই আবার? খুব আছে, কিন্তু ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে।"

"কি রকম?"

"এই দেখ না,—ছুঁৎমার্গের ত হাজার রকম ফ্যাকড়া আছে। মুচির ক্ষৌরীর প্রশ্ন সেই হাজারের মধ্যে একটা মাত্র। দেখলে ত একটু আগে,—এর যুক্তি বামুন ঠাকুর বুঝলেন, পরামাণিক ভায়াও বুঝল। মুচি তোমার আমার মত মানুষ, এই কথা ভেবে তাদের হৃদয়ও একবার সাড়া দিল। কিন্তু ব্যস্, ঐ পর্য্যন্ত। প্রতীকারের কথা উঠতেই পরামাণিক দাঁড়ালো বামুন ঠাকুরের আড়ালে,—বললে, বামুন ঠাকুর হুকুম দিলে তবে পারি, আর বামুন ঠাকুর দাঁড়ালেন 'সকলের' আড়ালে,—বললেন 'সকলে' মত দিলে আমার আর অমত কিসের।"

"সে আর মন্দটা কি হ'ল দাদা? বামুন ঠাকুর ত একরকম সম্মত হলেন, পরামাণিকও তাই। সুতরাং পথ পাওয়া গেল। এখন 'সকলে' মত দিলেই ত ব্যাপারটা মিটে যায়।"

কিন্তু এত সহজে মিটবে কি? এই 'সকলে'কে পাই কোথায়? কাকে ধরি কি ক'রে? প্রত্যেকেই 'সকলে'র দোহাই দেয়,—কিন্তু 'সকলে' ধরা দেয় না। প্রত্যেকেই নিজের কর্ত্তব্যের দায় 'সকলে'র উপর চাপায়, কিন্তু এই 'সকলে' শুধু দৃষ্টি এড়ায়, কোন দায়ই ঘাড়ে নেয় না।"

"কথাটা বুঝলুম না দাদা, হেঁয়ালির মত ঠেকছে।"

"তা বটে, একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে।—আমাদের দশাই ঐ,

কেতাবী বিদ্যের ঝাঁজ মরতে চায় না। হাঁ, কথায় বলে,—'সবার কাজ কারও কাজ নয়'। এটা ত বুঝতে পার?

"তা পারি বৈ কি।"

"তা হ'লেই দেখ না কেন,—আমি প্রায় ঐ কথাই বলছি।"

"অর্থাৎ আপনি বলছেন আমাদের ঐক্য নেই।"

"কতকটা তাই, আবার নয়ও বটে।"

"কি রকম?"

"এই নতুন পথে পা দিতে আমরা একেবারে নারাজ। ভাল ব'লে যেটা বুঝি, চল্‌তি প্রথার উল্‌টো হ'লে সেটা করতে আর আমাদের ভরসা হয় না, সাহসে কুলোয় না। আমরা এড়িয়ে চলি, হৃদয় আমাদের ঘুমিয়ে আছে, সহজে সাড়া দেয় না। দেখনা, আমাদের পঞ্চায়েৎ বসে, "পঞ্চগ্রামী" হয়, তার ভিতর সমষ্টি-শক্তির পরিচয়ও পাই, তার মধ্য দিয়ে সেই 'সকলে' উঁকি মারে,—কিন্তু সে নিতান্তই সেকেলে 'সকলে', একালের দায় ঘাড়ে নেবার মত মজবুত সে নয়। তাই একটা নতুন 'আমরা', একটা বলিষ্ঠ 'সকলে', নব বলে বলীয়ান্ একটা সমষ্টি দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে সৃষ্টি করতে হবে, যারা এই ঘুমন্ত জাতিটাকে বাঁচবার সত্যপথে এগিয়ে দেবে।"

"দাদার কথা আবার সেই ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।"

"ঠিক বলেছ ভাই। তবে ভরসা এই যে আমি যা বলতে চাই, তার উদাহরণ হাতের কাছেই রয়েছে।"

"হাতের কাছে?"

"তা বৈ কি। বেশী দিনের কথা ত নয়, এই ১৯৩২ সালের আন্দোলনের সময় আমাদের সালেপুর অঞ্চলে কি হয়েছিল? বড়ভোঙ্গল, মাণিকপাট এই সব গ্রামের লোক যখন ট্যাক্স-খাজনা বন্ধ করলে, তখন কি হয়েছিল? মনে নেই সে সব কথা?"

"মনে আবার নেই? আরে বাপরে! সে কি মালক্রোক-অস্থাবরের ঠেলা। থালা, বাটি, গাড়ু, ঘড়া, যা পেলে তাই উঠিয়ে নিয়ে গেল। হালের গরু নিয়ে গেল, মরাই ভেঙ্গে ধান ছড়িয়ে দিলে। গুঁতো দিতে দিতে মানুষের টুঁটি কি টিপেই ধরেছিল! ঘরে ঘরে গরীব গৃহস্থ একেবারে উৎখাত?"

"তোমরা খুব ভয় পেয়েছিলে বুঝি?"

"ভয় আবার কিসের দাদা? আপনার বাপ-মার আশীর্ব্বাদে ভয়ে আমরা কেউ কুঁকড়ে কেঁচো হয়ে যাই নি। নিজের মান-ইজ্জৎ নিজে রাখবো, তাতে দু'ঘা লাঠিই যদি পড়ে ত বুক পেতে তা নিতে হবে।"

"তা ঠিক বলেছ ভাই, কিন্তু তখন সকলে মিলে সে সাহস পেলে কোথা থেকে? তোমরা ত আর মারের বদলে মার দাও নি।"

"না দাদা, সেটা নিষেধ ছিল, তা সে ঠিকই ছিল। নহিলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হ'য়ে শেষে আমরাই হয়ত ভেঙ্গে পড়তুম। কিন্তু মন আমাদের ছিল রেগে,—এ কথাও সাফ্ বলছি। কি বল দাদা, নিজের ঘরে ব'সে,—হোক্ না সে কুঁড়ে ঘর,—নিজের

ঘরে ব'সে নিজে অপমান! গরীব ব'লে কি আমরা মানুষ নই ?"

"সত্য কথাই বলেছ ভাই। মনের রাগ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যখন অত্যাচারের সামনে দলে দলে হাসিমুখে বুক পেতে দিতে পারবো, তখন ত আমাদের জয়জয়কার হবে। তখন বুক ফুলিয়ে দেশের বুকের উপর স্বরাজের ধ্বজা তুলে দেবো। কিন্তু কি কথা হচ্ছিল আমাদের ?"

"মালক্রোকের কথা, অস্থাবরের কথা।"

"হাঁ মনে নেই, সেই ক্রোক-করা মালপত্রের কি অবস্থা হ'য়েছিল ?"

"মনে আবার নেই। মালগুলো একে একে নিলামে উঠ্‌তে লাগলো, কিন্তু নিলাম ডেকে নেবার একটাও লোক পাওয়া গেল না এ তল্লাটে।"

"তবেই দেখ, আমাদের ঐক্য নেই বলছিলে ভাই। এই ত, এত বড় ঐক্যের সৃষ্টি তোমরাই করেছিলে। নিলাম ডাকবার লোকটি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। এ কি কম গৌরবের কথা। একেবারে শতকরা একশ' জন একমন একপ্রাণ,—সবাই নতুন পথের পথিক হয়ে দাঁড়িয়েছিলে!"

"হাঁ দাদা, সত্যিই সেদিন সাহস ক'রে নতুন পথে দাঁড়িয়েছিলুম আমরা সকলে।"

"হাঁ, হাঁ,—আমরা সকলে। এইবার ধরা দিয়েছে ভাই,—এই সেই নতুন 'আমরা', সেই বলিষ্ঠ 'সকলে',—যার সন্ধানে এতকাল

ঘুরে বেড়াচ্ছি। একে জাগাতে হবে দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, একে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, একদিন এরাই হবে সারাদেশ জুড়ে আমাদের স্বরাজ-সৌধের পাকা ভিত।"

"বুঝতে পেরেছি দাদা। এই নতুন 'আমরা' যখন মাথা ঝাড়া দিয়ে শক্ত হ'য়ে দাঁড়াবে, এই নতুন 'সকলে' যখন সমাজের সকল দায় ঘাড়ে নেবার জন্যে এগিয়ে আসতে পারবে, তখন মিথ্যে ছোঁয়াছুঁয়ি বাচবিচার, মিথ্যে উঁচুনীচু ভেদাভেদ সব ঘুচে যাবে। সূর্য্যের আলোর সামনে তখন কুয়াসার আঁধার আর তিষ্ঠতে পারবে না। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"কিন্তু আজ আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবি, কেমন ক'রে সেদিন তা সম্ভব হয়েছিল,—গ্রামের পর গ্রাম, সব লোক এক মত, এক দিল,—সব সাহসে বুক বাঁধা!"

"সম্ভব হ'য়েছিল নতুন যুগের হাওয়ায়, স্বরাজের বাণী কানে পৌঁছেছিল ব'লে। মহতের আহ্বান এসেছিল, বৃহতের নেশা ধরেছিল, নতুন করে বাঁচবার আশা জেগেছিল,—তাই বিদেশী শাসন, জমিদার, পুলিশ,—সকলের রক্ত আঁখিকে হাস্যমুখে উপেক্ষা করা সহজেই সম্ভব হয়েছিল।"

"ঠিক বলেছ দাদা, বাঁচার মত বাঁচতে হ'লে সেই পথই আমাদের ধরতে হবে।"

"কিন্তু পথ চলবার পাথেয় ত চাই।"

"সে আবার পাব কোথায়?"

"দুর্গম পথ কিনা,—তার পাথেয় সংগ্রহ করতে হ'লে

ভাবগঙ্গায় স্নান করতে হবে, প্রিয়জনকে ছাড়তে হবে, দুঃখের আগুনে পুড়তে হবে, দারিদ্র্যের কশাঘাত খেতে হবে, রোগের জ্বালায় জ্বলতে হবে, নির্য্যাতন বুক পেতে নিতে হবে। তবেই পথের সম্বল পাওয়া যাবে।"

"তারপর ?"

"তারপর অন্ধকারের বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে বাসা বাঁধতে হবে সেই সবহারাদের মাঝে, যাঁদের বাঁচায় বিড়ম্বনা, আর মরায় সুখ। তাদের মধ্যে যেতে হবে ভালবাসার আলো নিয়ে, দুর্দ্দম সাহস নিয়ে, অপরাজেয় আশা নিয়ে,—যেতে হবে অফুরন্ত কর্ম্মশক্তি নিয়ে, বলিষ্ঠ বিশ্বাস নিয়ে, অনাসক্ত মন নিয়ে,—যেতে হবে শুচি হয়ে, দক্ষ হ'য়ে, বীর্য্যবান্ ও ধৃতিমান্ হ'য়ে। সেবার সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়ে তুলতে হবে তাদের প্রাণ, বিপ্লবের দোলায় দুলিয়ে দিতে হবে তাদের মন, আর গ'ড়ে তুলতে হবে সেই নতুন 'আমরা', সেই নবরাগরঞ্জিত 'সকলে'। তখন দেশের দিকে দিকে আগুন জ্বলবে, যত বন্দীশালা সব পুড়ে ছাই হ'বে, যত অচল আড়ষ্ট মন সচল ও সবল হ'য়ে উঠবে, আর নবীন ভারত স্বাধীনতার পথে মুক্তি পেয়ে বাঁচবে।"

প্রাণের আগুন এমন করিয়াই সেদিন ঠিকরিয়া পড়িল। বন্ধু চুপ করিলেন, আমরা স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। কখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। নিখিল ভুবন নিস্তব্ধ। নদীর বুকে তারার আলো, আর বন্ধুর চোখে সে কি অপূর্ব্ব দীপ্তি,—যেন কোন্ অগ্নি-পরীক্ষায় পার হওয়ার খবর সেখানে পৌছিয়াছে।

সাত

পরদিন বেলা প্রায় দশটা, জ্যৈষ্ঠমাসের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। দাদাঠাকুরের খোঁজে আমরা নদীর বাঁধের উপর আসিয়া উপস্থিত। তিনি তখন একহাতে রাজমিস্ত্রীর মাথায় ছাতা ধরিয়া, অপর হাতে দিব্য নির্ব্বিকারভাবে গামছা দিয়া গায়ের ঘাম মুছিতেছেন। আমাদের দেখিয়া খুসীতে তাঁর মুখ-চোখ ভরিয়া গেল। হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, যা হোক্, কাল রাত থেকে আশা ক'রে রয়েছি। তোমাদের একটা কথারও কি ঠিক থাকতে নেই?"

"ঠিক কথাটিই ব'লেছেন দাদাঠাকুর। পথ চলতে চলতে কতবার যে আমাদের থম্‌কে দাঁড়াতে হয়, তার ঠিকানা নেই। যাহোক, তবু জোর কপাল যে একটা মানুষকে রাত-ভোর আশায় আশায় রাখতে পেরেছি। আমাদের এই ভাগ্যবানের দলের আশা ত কেউ কখন করে না।"

"জ্যাঠামি রাখ। * * * গেল কোথায়?"

"দাদার কথা বলছেন? তিনি ত বিধাতার একটি সেরা অনাসৃষ্টি। তাঁর খবর জানবো কি ক'রে?"

"কেন? তার ত তোমাদেরই সঙ্গে আসবার কথা।"

"কথা ত ঠিক, আসছিলেনও আমাদের সঙ্গে। তারপর কাল

রাতে বাঁধের উপর কথা কইতে কইতে হঠাৎ কোন্ কাজের খেয়ালে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়েছেন।”

“অনাসৃষ্টিই বটে! আজ বিশ বৎসর ধ’রে এই মানুষটির গতিবিধির ঠিকানা আর করতে পারলুম না। হয়ত কোথায় কার মড়া আগ্‌লে ব’সে আছে। মরুক গে—। তা ভাই; তোমরা ঐ পাকুড় গাছটার ছায়ায় গিয়ে বস। দেখছ না, রোদের কি তেজ।”

আমরা ছায়ায় আসিয়া বসিয়া বাঁচিলাম। রাজমিস্ত্রীর রকম দেখিয়া আমাদের একজন বলিল, “ওহে ভাই রাজমিস্ত্রী, তুমি যে সত্যিই রাজা হ’য়ে বসেছ, আর দাদাঠাকুর তোমার মাথার উপর রাজছত্র ধ’রে আছেন।”

“আবার কেন ওকে ক্ষ্যাপাও ভাই, জ্যৈষ্ঠের দুপুরে একেই ত ওর মাথা গরম হ’য়ে উঠেছে। দেখছ না, কতখানি কাজ ওকে তুলতে হবে। শ্লুসের খিলানটা যে এখনও অনেক বাকী।”

এই কথা বলিয়া দাদাঠাকুর হাত বদল করিয়া মিস্ত্রীর মাথায় ছাতাটা আবার ঠিকমত ধরিলেন, এবং ভিজা গামছাখানা নিজের মাথায় টানিয়া দিয়া, পিছন ফিরিয়া বলিলেন, “নে, নে, ভাই বড় বৌ, দেরী করিস্‌নে, ঝপ্ ঝপ্ ক’রে আর ঝোড়া কতক মাটি ফেলে দিয়ে এই গর্ত্তটা বুজিয়ে দে দেখি। বৃষ্টি নেমে শেষটায় সব পণ্ড ক’রে না দেয়! কাজ ত হাতে নিয়েছি,—এখন শেষরক্ষা কি ক’রে হবে, সেই ভাবনায় আমার গায়ের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে।”

বড় বৌ হইল সাঁওতাল বৌ। রং কালো, দিব্য হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, সর্ব্বাঙ্গে স্বাস্থ্যশ্রী, সিঁথিতে সিন্দুর, কপালে টিপ, মুখ হাসিভরা। "তোর ভয়টা কিসের শুনি, দাদাঠাকুর। কেন তুই পরের জন্যে এমনি ক'রে দুপুর রোদে খেটে মরছিস? কি হবে মিছিমিছি লোকের গাল কুড়িয়ে? তার চেয়ে ঘরে গিয়ে খেয়ে দেয়ে শুয়ে ঘুমোগে যা।" বলিতে বলিতে বড় বৌ ক্ষিপ্র-পদে মাটি বহিতে লাগিল।

ক্ষুধাতৃষ্ণায় আমরা বেশ একটু কাতর হইয়াছিলাম। তাই সাঁওতাল বৌয়ের কথায় ঘরে গিয়া খাইয়া দাইয়া ঘুমাইবার লোভ আমাদের জাগিয়া উঠিল। বলিলাম, "দাদাঠাকুর, বড় বৌয়ের কথা রাখুন, আমাদের নিয়ে ঘরের দিকে চলুন। ঘরের না খেলে বনের মোষ তাড়াব কি ক'রে?"

দাদাঠাকুর বলিলেন, "চল, যাই ভাই, আর দেরী করবো না।—হাঁ, দেখ মিস্ত্রী, এই ক'টা দিনে কাজটা শেষ করতেই হবে।"

মিস্ত্রী বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, মজুরীর টাকাটা কিন্তু ঠিক ঠিক দিয়ে যাবেন। টাকা না দিলে কাল থেকেই আমরা কাজ বন্ধ করবো ব'লে দিচ্ছি।"

দাদাঠাকুর নিরুত্তরে আমাদের লইয়া ঘরের দিকে চলিলেন। বুঝিলাম শ্লুস লইয়া তিনি মহা দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন। বহু সহস্র বিঘা জমি সহজে সেচের জল পাইবে, এই আশায় তিনি শ্লুসের কাজে হাত দিয়াছেন। কিন্তু চাঁদার টাকায় কাজ,—দিতে

যাঁরা প্রতিশ্রুত, এমন অনেকেই এখন হাত গুটাইয়া বসিয়াছেন। ফলে কাজে ঢিলা পড়িতেছে। মজুরী না পাইয়া মিস্ত্রী কামাই করিতেছে। এদিকে বর্ষা আসিয়া পড়িল। বর্ষা নামিলে আর রক্ষা নাই। বানের জলে বাঁধ ভাঙ্গিয়া, গ্রাম ভাসাইয়া সর্ব্বনাশ করিবে।

দাদাঠাকুরের ঘরে আসিয়া আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বাপ রে, কি রৌদ্রের তেজ! কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর মুড়ির সঙ্গে ঘরে-পাতা উৎকৃষ্ট দধি মাখিয়া, আহা! কি তৃপ্তির সে জলযোগ। দাদাঠাকুর পুকুরে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিলেন। যথাসময়ে আহারাদি শেষ করা গেল। আশা ছিল, নিরুদ্দেশ দাদাটি অন্ততঃ আহারের সময়ে আসিয়া জুটিবেন। কিন্তু তিনি জুটিলেন না। আহারান্তে একটু নিদ্রার পর কিছুক্ষণ সুতা কাটিয়া, আমরা আবার বাঁধের দিকে চলিলাম। দাদাঠাকুর বহুক্ষণ পূর্ব্বেই সেদিকে চলিয়া গিয়াছেন। বাঁধে পৌছিয়া দেখি, রাজমিস্ত্রী দস্তুরমত রাজকীয় চালে কথাবার্ত্তা চালাইতেছে,—“মজুরী যদি আজ চুকিয়ে দিতে না পারেন, তবে রইলো আপনার কাজ। দিব্যি ক'রে বলছি, আর কখন আপনার কাজে হাত দেব না।”

দাদাঠাকুরের ত চক্ষুস্থির! তিনি একান্ত মিনতির স্বরে বলিলেন, “এই হাতযোড় ক'রে বলছি বাবা, তোদের মজুরীর টাকা মারা যাবে না। বামুনের কথা রাখ্, এ দায় থেকে আমাকে উদ্ধার কর্। নহিলে সর্ব্বনাশ হবে।”

মিস্ত্রী মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল। আমরা দাদাঠাকুরকে লইয়া বাঁধের উপর বসিলাম। দ্বিপ্রহরে অসহ্য গরম গিয়াছে। সূর্য্যাস্তের পর এখন একটা সুখস্পর্শ সমীরণের হিল্লোলে গুমোট কাটিয়া গেল। বুঝিলাম সত্যই গ্রীষ্মে "দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ"। নদীর চরে বাগ্‌দী মেয়ে তখনও ঘুসিং কুড়াইতেছে। ঘুসিং থেকে চূণ হইবে, গাঁথুনির কাজে লাগিবে। দাদাঠাকুরের মাথা শ্লুসের কথায় ভর্ত্তি হইয়া আছে। এই ব্যাপার লইয়া তাঁহার উৎসাহ যত, দুর্ভাবনা তার চেয়ে অনেক বেশী। তিনি বলিলেন, "আর ভাই, টাকা কড়ি কেউ দিতে চায় না। কাজটা কি ঠিকমত শেষ কর্ত্তে পারবো?"

"ঠিক হ'য়ে যাবে দাদাঠাকুর। দেখবেন, মিস্ত্রী আবার কাল সকাল বেলা এসে হাজির হবে। লোকটা হাজার হোক পাকা, তার উপর আপনাকে ভালমতে চেনে। হাতের কাজ সে নিশ্চয়ই শেষ ক'রে দেবে।"

আমাদের কথায় দাদাঠাকুরের মুখের ভাবটা যাকে বলে 'ভয় নেই, ভরসাও নেই'—এইমত হইল। তিনি বলিলেন, "কি-ই বা হবে একটা শ্লুসে। 'শিরে কৈল সর্পাঘাত, তাগা বান্ধিব কোথা?'—আমাদের অবস্থাটা হ'ল তাই। আসল সমস্যাটা রইলো প'ড়ে,—শুধু এখানে একটু মাটী ফেলে, আর ওখানে একটা খিলান গেঁথে কোন্ দিক সামলানো যাবে?"

"তাই যদি হয়, তবে, এ কাজে হাত দিলেন কেন?"

"অভ্যাসের দোষ ভাই। জানি সব, বুঝি সব, তবু হাত না

দিয়ে পারি না। ভাবি, দৈব যদি সহায় হন, বাঁধ যদি না ভাঙ্গে, তবে স্লুসের জলে কয়েক হাজার বিঘে জমি সময়ে ঠিকমত সেচ পাবে। তারপর ফসল হ'লে লোকে তখন খেয়ে বাঁচবে।"

"আর স্বদেশীর পোড়া কপালে বাঁধ যদি ভাঙ্গে?"

"ও কথা মুখে এনো না ভাই। বাঁধ যদি ভাঙ্গে, তবে সর্ব্বনাশ হবে। গ্রাম ভেসে যাবে, বাড়ী ঘর পড়ে গিয়ে লোকে আশ্রয়হীন হবে, ফসল নষ্ট হবে, চাষের জমিতে বালি উঠবে,—আর লোকের গাল খেয়ে খেয়ে আমাদের চৌদ্দ পুরুষ লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায়, একবারে মাটিতে মিশিয়ে যাবে।"

"কিন্তু বাঁধই বা এত ভাঙ্গে কেন দাদাঠাকুর? এর কি কোনো বিহিত করা যায় না?"

"ভাঙ্গে আবার কেন? ভরা বর্ষায় ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে পাহাড়ের জল যখন অজস্র ধারায় নেমে আসতে থাকে, তখন সেই জলধারাকে ধারণ করে কে?"

"কেন, আমাদের এই দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, দামোদর, কংসাবতী প্রভৃতি নদী।"

"কিন্তু জলের গতিবেগ প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হ'য়ে উঠলে বাঁধের শক্তিতে আর কুলোয় না,—তখন জলের ধাক্কায় নদীর ডাইনে বাঁয়ে কোথায় বাঁধ ভেঙ্গে, কোন্ গ্রাম ভাসিয়ে, কার সর্ব্বনাশ করবে, তার আর ঠিকানা থাকে না। ত্রাসে সকলে 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়তে থাকে।"

"কিন্তু এর প্রতীকারের কি কোন উপায়ই নেই ?"

"নিরুপায় দেশে আর উপায় কি হবে বলো। নহিলে বিজ্ঞানের যুগে কত অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে, আর বর্ষার জলকে নদীপথে আয়ত্ত করা যায় না।"

"কি রকম ?"

"রকম আর কি ? এই-জল যে মানুষের আয়ত্ত ছিল, আজও তার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। আজও পশ্চিম বাঙলার সর্ব্বত্র অসংখ্য পুরাতন খালের খাত রয়েছে। এককালে পাহাড়ের বিপুল জলরাশি নদীর দুধারে এই সব খালের পথে সারা রাঢ়দেশে ছড়িয়ে পড়তো। সঙ্কীর্ণ নদীপথে তাই জল অসম্ভব ফুলে উঠে, পদে পদে হানা সৃষ্টি ক'রে সর্ব্বনাশ করতো না ?"

কিন্তু এখন ?"

"দেখতে ত পাচ্ছ ভাই, যে ছিল পরম বন্ধু, মানুষের বুদ্ধির দোষে আজ সে-ই হয়েছে চরম শত্রু। পাহাড়ের লাল জল সহস্র পথে সহস্র ধারায় ছড়িয়ে প'ড়ে দেশের মাঠঘাটকে স্নান করিয়ে দিতো। তারই পলি বছর বছর দেশের মাটিকে উর্ব্বর করে মাঠে মাঠে সোনা ফলাতো। নতুন জলধারার সংযোগে পুকুরে পুকুরে অজস্র মাছ জন্মাতো, গাছপালায় তেজ হ'তো, আর সারা দেশটা ধুয়ে গিয়ে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের বিষ ম'রে যেতো। তাই পণ্ডিতরা বলেন, এ ত বন্যার লাল জল নয়, এ স্বর্ণরেণুর ধারা। আজ সেই বানের জলই

আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হ'য়েছে। বন্ধুকে আমরা শত্রু ক'রে বসেছি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দাদাঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, "নদীমাতৃক দেশে নদীপথ নষ্ট হ'তে দিয়ে আমরা মাতৃহত্যার অপরাধ করেছি। বিদেশী রাজা তার শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখবার জন্যে অসংখ্য রেলপথ সৃষ্টি ক'রে জলের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে। নদীস্রোত অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে আমাদের জীবন-স্রোত ক্ষীণ হয়ে আসছে। মৃত্যুর কাল ছায়া দেশের উপর দিন দিন ঘন হচ্ছে। স্বাধীন দেশ যদি আমাদের হ'তো, তবে দেখতে দেশে নতুন ক'রে বাঁচবার ইচ্ছা জেগেছে, বিজ্ঞ লোকে মাথা ঘামিয়ে, জরীপ ক'রে জলপথের নক্সা এঁকেছে, বিশেষজ্ঞ নেতার অধীনে লক্ষ লক্ষ লোক স্বেচ্ছায় ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে উদ্ধারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নদীর বন্ধনদশা ঘুচিয়ে, নবগঙ্গার সহস্রধারায় অভিসিঞ্চিত ক'রে, যিনি দেশকে নবজীবন দান করবেন, আমরা আজ সেই ভগীরথের অপেক্ষায় আছি।"

আট

রাত্রে আমরা 'সাগর-কুটীরে' আসিলাম। বড়ডোঙ্গল গ্রামে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে সাগর-কুটীরের নাম এই অঞ্চলের কে না জানে? জায়গাটা খুব ফাঁকা,—গরীবের স্বাস্থ্য-নিবাস বলা চলে। সহরের নেতাগিরি, বক্তৃতার ছড়াছড়ি, মতবাদের হুড়োহুড়ি এবং বিবৃতির বাহাদুরী,—এই সব অতি উচ্চাঙ্গের ব্যাপার-গুলিতে সমান অরুচি বলিয়া যাহারা গ্রামে পড়িয়া পচে, এমন এক-আধ জন কর্ম্মীর একটু আরামের স্থল হইল এই সাগর-কুটীর। সাগর হাজরা মরিয়া তার বন্ধুদের জন্য এই আশ্রয়টুকু রাখিয়া গিয়াছে। ১০৫ ডিগ্রী জ্বরে যখন পা আর চলে না, রক্তামাশয়ের দুর্ব্বলতায় চোখে যখন অন্ধকার দেখিতে হয়, তখন এই সাগর-কুটীরে আশ্রয় লইয়া, শুইয়া শুইয়া স্বরাজের স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন দেখ, যতদিন না আবার তারই বোঝা গ্রামে গ্রামে বহন করিয়া বেড়াইতে পার। আন্দোলনের সময় সাগর-কুটীরে পুলিশে বাসা বাঁধিয়াছিল। সাগর হাজরার পক্ষপাত নাই,—'সম শত্রৌ চ মিত্রে চ'। জীবনের পরপার হইতে নিশ্চয়ই সে পুলিশের শুভ কামনা করিয়াছিল। তার স্মৃতি-কুটীরের সৌভাগ্য আর কোন্ পথে বা আসিতে পারে? চকিতে এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে বারান্দায় উঠিয়া দেখি, কয়েকজন উড়িয়া মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছে। ইহারা পাল্কী বহে। আমাদের দেখিয়া বড় খুসী হইল না। কেনই বা হইবে?

সারাদিন খাটিয়া সবেমাত্র এই একটু আরাম করিতেছে, এমন সময় আগন্তুককে কেই বা পছন্দ করে? আমরা কিন্তু 'স্বদেশী' লোক। সাগর-কুটীরের উপর আমাদের বিশেষ দাবীর অহঙ্কারটা নিশ্চয়ই মনের তলে তলে ছিল। তাই একটু গরম হইয়াই বলিলাম, "যাও হে বাপু, এখান থেকে স'রে যাও। আমরা এখানে থাকবো।"

"তোমরা বারান্দার ঐদিকে থাকগে যাও বাবু, আমরা এখন আর উঠবো না।"

"কেন? উঠবে না কেন শুনি? তোমাদের যদি উঠিয়ে দি।"

"সে কি মশাই, চিরকালটা রাতের বেলা এইখানে থাকি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বাদ নেই,—আর আপনারা আজ কোথা থেকে এসে বলছেন, উঠিয়ে দেবো। আপনারা কা'রা মশাই?"

রাত বেশী হইয়াছিল,—মেজাজটা একটু বেশী কড়া করিয়াই বলিলাম, "কারা আবার? জান না, যারা স্বদেশী ক'রে বেড়ায়।"

"আপনারা স্বদেশী বাবু? কই স্বদেশী বাবুরা ত আমাদের তাড়িয়ে দিতে আসে না। তা'রাই ত আমাদের এখানে থাকতে দেয়। আমরা গরীব লোক।"

"সাগর হাজরার জয় হইল। আমরা হার মানিলাম, লজ্জাও বড় কম পাইলাম না। গলার চড়া সুর আপনি নরম হইয়া গেল। মাদুর বিছাইয়া তাহাদের পাশে শুইয়া 'হরিনাম' করিবার প্রস্তাব করিলাম। অত রাত্রে তাহারা আর হরিনামে রাজী হইল

না, কিন্তু বিবাদ মিটিয়া গেল। কথায় কথায় তাহাদের উড়িয়্যায় জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী শুনিলাম, আরও শুনিলাম কংগ্রেসের স্বরাজ হইয়া নাকি জমিদার শায়েস্তা হইয়া গিয়াছে,—প্রজার আর ভয়-ভাবনা নাই। বুঝিলাম, কংগ্রেস ভরসা যত জাগাইয়াছে, আমাদের দায়ও তত বাড়াইয়াছে। কিন্তু দেশে যখন সব চেয়ে কঠিন দায় ঘাড়ে লইবার আহ্বান আসিয়াছে, তখন বুদ্ধিভেদ ও গৃহভেদের ছিদ্র-পথে দায়বোধ যে আমাদের শূন্যে মিলাইল,—একথা আজ কে বুঝিবে, কেই বা বুঝাইবে!

শুইয়া পড়িলাম। সাগর হাজরা মনের উপর জাঁকিয়া বসিল। পাতলা চেহারা, হাসি হাসি মুখ, কোথায় ধান-চালের কারবার করিত। বন্যা হইয়াছে শুনিয়া একবারে আরামবাগে আসিয়া হাজির। সে আজ প্রায় বিশ বৎসরের কথা। সহরের ছেলে, কিন্তু কেমন তার মতি হইল,—বন্যার সূত্রে গ্রাম-অঞ্চলে থাকিয়া গেল। তারপর দেখিতে দেখিতে কারও দাদা, কারও কাকা, কারও মামা হইয়া, গ্রামের পরম আত্মীয় হইয়া উঠিল। সাগর চরকা লইয়া ফিরে, চাষীর কাস্তে কাড়িয়া ধান কাটে, তার হুঁকায় তামাক খায়, ছুতার-কামারের বাড়ী আড্ডা জমায়, বাগ্দীর বাড়ী ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। গরীব মুসলমানের ঘরে "মার অনুগ্রহ" হইয়াছে,—সাগর সেখানে গিয়া রোগীসেবা করিতে এক সপ্তাহ কাটাইয়া আসে। কোদাল, কুড়ুল, করাত, কন্নিক,—তার হাতে সবই চলে। প্রবল বন্যায় নদীর বাঁধে হানা হইয়া গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে,—রাত্রি অন্ধকার,

ঝড়জলের বিরাম নাই। সাগর হাজরা চাল-চিঁড়া লইয়া হানার প্রবল জলস্রোতের উপর নৌকা চালাইয়া দিয়াছে,—আশ্রয়হীন গ্রামবাসীকে বিপদের দিনে আর যে ছাড়ুক, সে ছাড়িতে পারে না। ভাদ্র-আশ্বিনে ঘর ঘর ম্যালেরিয়া,—মানুষগুলো সব ভুগিয়া ভুগিয়া প্রেতের মত হইয়াছে,—মোটা মোটা পেট, কাটির মত হাত পা, আর কোটরগত চোখ,—কুইনাইনের পয়সা জোটে না। সাগর হাজরা উত্যোগ আয়োজন করিয়া জালা জালা পাঁচন তৈয়ারী করিল,—গরীব তবু রোগে দু খোরাক ঔষধ পাইবে। বামুনবাড়ী দুর্গাপূজা,—ছোট (?) জাতের আহ্বান হয় না। সাগরের মন দুলিল। অমনি পূজার আয়োজন হইয়া গেল। কুমোর প্রতিমা গড়িয়া দিল, চাষী চাল দিল, গয়লা ঘি দই দিল, কাঠুরিয়া কাঠ দিল ··ইত্যাদি। খুব ধুম পড়িয়া গেল। পূজার হাওয়ায় ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ একই সুর শোনা গেল,—

"এস হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান-ভার।"

প্রকৃতপক্ষে বামুন সাগর হাজরার জীবন-বাঁশীতে ঐ একটা সুরই ছিল। সে ছিল সেই জাতের বামুন, যার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন,
ধর হাত সবাকার।"

তারপর তার যক্ষ্মা হইল। তারপর চিকিৎসার জন্য তাকে গ্রাম ছাড়িতে হইল।—তারপর আর সে ফিরিল না!

নয়

দুপুর বেলা বড়ডোঙ্গলের হাট বসিয়াছে। আনাগোনা, বেচা-কেনা জমিয়াছে ভাল। হাটের ভিতর এক কুমোরের দোকানের সুমুখ দিয়া যাইতেই সে উৎসাহ করিয়া আমাদের ডাকিয়া বসাইল। বলিল, "চিনতে পারেন ?"

তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলাম, কিন্তু ঠিক চিনিতে পরিলাম না। একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া সে বলিল, "কেন, দমদম জেলে ?"

"ঠিক কথা, অনেকদিন ত হয়ে গেল, তাই চেনা মুখও অচেনা হয়ে আসছে। তারপর, সব ভাল ত ?"

"ভাল আর কোথায় মশাই। এত বড় হাঁড়ি-কলসীর বোঝা মাথায় ক'রে, এই রোদে প্রায় তিন ক্রোশ পথ হেঁটে এসেছি, এখন তিন গণ্ডা পয়সার মাল বিক্রী হয় কি না হয়। এমন ক'রে আর ত চলে না।"

বাস্তবিকই আর চলে না। কিন্তু আশা-উৎসাহের ভুটা ভূয়া কথাই বা তাহাকে বলিয়া কি হইবে ? গ্রামের শিল্প কেন ধ্বংস হইল, কেন মানুষ দারিদ্র্যের অতলে তলাইয়া গেল, কোথাকার শিল্পবিপ্লবের ধাক্কা পরাধীন দেশের কোথায় আসিয়া লাগিয়া কাহার সর্ব্বনাশ করিল, কাহার ক্ষুধার অন্ন কাড়িয়া লইয়া কাহার গৃহস্থালী ভাঙ্গিয়া দিয়া, কাহাকে পথে বসাইল,—এই

সব কথার কেতাবী আলোচনা করিলে উপস্থিত হাটের বেলায় তার বিক্রী এক পয়সাও বেশী হইবে না। তাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। সে আবার বলিতে লাগিল, "শুনছেন, আমাদের * * * এর উপর যে খুর জুলুম চলেছে। কাল সারাদিন তাকে এই কাঠফাটা রোদে জমিদারের কাছারী-বাড়ীর উঠোনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। আবার বলে, জুতিয়ে বিষদাঁত ভেঙ্গে দেবো।"

"কেন? হ'ল কি?"

"সেই সব পুরানো ব্যাপার। গত আন্দোলনের জের এখনও টানছে আর কি।—আচ্ছা, গতিমুক্তি একটা কিছু হবে না গা? আমাদের ত প্রাণান্ত। ছেলেপুলের মুখে দুবেলা ভাত যোগান দায় হ'ল।"

কি জবাব দিব? চুপ করিয়া রহিলাম। দোকানী তারপর একটু রসিকতার সুরে' বলিল, "ছেঁড়া চটখানায় বসতে দিয়ে দেখছি আপনাদের মান রাখতে পারলুম না।" বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল। আমরাও হাসিতে যোগ দিলাম।

হাট ছাড়িয়া বৈকালে আমরা গ্রামান্তরে চলিলাম। * * * দাদার আশ্রয়ে দিন দুই তিন ভারি আনন্দে কাটিল। পেশোয়ারী খাঁ সাহেব বরাবর আমাদের সঙ্গে আছেন। একদিন সকাল বেলা তিনি নদীর অপর পারে, একটু দূরে মহিষগোঠ গ্রামে নামাজ পড়িতে গেলেন। বৈকাল বেলা সংবাদ আসিল,

রাত্রে সেখানে খাঁ সাহেবের বক্তৃতা হইবে, আমাদের সকলের নিমন্ত্রণ। খুসী হইয়া আমরা রওনা হইলাম। নদী পার হইয়া মাঠে পড়িলাম। গত বৎসর এদিকে হানা হইয়াছিল। বন্যার সময় জলের উন্মত্ত স্রোতে তাড়িত হইয়া, নদীগর্ভের বালি হানার মুখে মাঠের উপর উঠিয়া, অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। বীভৎস দৃশ্য! যেন মরুভূমির একটা জিহ্বা শ্যামল জনপদের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে,—তাহাকে আপন গ্রাসের মধ্যে টানিয়া লইবে বলিয়া। যেখানেই নদীতে হানা পড়িয়াছে, সেখানেই মাঠের উপর এই দৃশ্য। সর্ব্বত্রই যেন মরুভূমি নদীর দুই দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে আপন অধিকারের নিশানা রাখিয়া চলিয়াছে।

ক্রমে আমরা মহিষগোঠে আসিয়া পড়িলাম। মহিষগোঠ ছোট গ্রাম, লোক সব গরীব। এক মুসলমান চাষীর ওখানে বক্তৃতা হইবে। গাছতলায় স্থান করা হইয়াছে। লোক-জন ক্রমশঃ আসিতেছে। গৃহস্বামী আমাদের খুব খাতির যত্ন করিয়া বসাইলেন। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার আমাদের বড় ভাল লাগিল। প্রথমে শিক্ষিত এক মুসলমান একখানি উর্দ্দু গান গাহিলেন। দেহতত্ত্বের গান, তার উপর বাঙলার খাঁটি মেঠো সুর,—লাগিল ভাল। তারপর খাঁ সাহেবের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। খাঁ সাহেব বাঙলা পড়িতে পারেন না, কিন্তু বলেন ভাল। চল্‌তি বাঙলার সঙ্গে নানা রকম আরবী, পারসী কথা মিশাইয়া, সুর করিয়া, আবেগ ভরে যখন তিনি অনর্গল

বলিয়া যান, তখন মনে হয়, দুর সীমান্ত প্রদেশের একটা মেঠো হাওয়া কেমন করিয়া যেন আমাদের এই বাঙলার মাঠে বহমান হইয়াছে। কোরানের কয়েকটি মূল উপদেশ নানা ভঙ্গীতে বুঝাইয়া দিয়া বক্তৃতা শেষ করিবার সময় তিনি বলিলেন যে 'আজাদী' অর্থাৎ স্বাধীনতা আমাদের চাই, কোরান মানুষ-মাত্রকেই স্বাধীন বলেন এবং হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া আমাদিগকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে। বক্তৃতা শেষ হইলে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। সভায় প্রায় জন ত্রিশ হিন্দু আসিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহারা এইরূপ কোরানের কথা শুনিতে আসেন এবং মুসলমানেরা তাঁহাদের গ্রামে মহাভারতের কথা শুনিতে যান। ব্যাপারটা নূতন কিছু নয়, বহু কাল ধরিয়াই এদেশে চলিয়া আসিয়াছে। তবু শুনিয়া বড় আনন্দ হইল। একজন চাষী মুসলমান কংগ্রেসের কথা জিজ্ঞাসা করিল। কংগ্রেস ভাল কিনা প্রশ্ন করিলে সে বলিল,—"হায় হায়, সে বছর হানা প'ড়ে আমাদের এদিকে সব যখন ভেসে গেল, তখন কংগ্রেসের সেই বামুন ঠাকুর গো,—মনে নেই সেই সাগর হাজরা, আর তোমার গিয়ে—তার সব লোকজন নৌকো নিয়ে এদিকে এসে প'ড়লো,—কত করলে গো আমাদের এই গরীবদের জন্যে। কতদিন তারা আমাদের মহিষগোঠে রইলো। বিপদের দিনে আর কে দেখেছে মশাই।"

কথাগুলির ভিতর যেন আশার আলো দেখা গেল। আজ হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া শুধু শিক্ষিতের মধ্যে। ইংরেজের অনু-

গ্রহে এবং অভিভাবকত্বে চাকরী-বাকরী যোগাড় করিয়া কে কতটুকু সুবিধা পাইতে পারে, ইহা লইয়া দুই পক্ষে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে,—কলহের আর অন্ত নাই। বিবাদের ধাক্কা নানা পথে গরীবের ঘরেও আসিয়া পৌছিতেছে। কিন্তু গরীবের অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ ইহাতে ঘুচিবে না। গরীবের জাতি নাই, তা সে হিন্দুই হোক, আর মুসলমানই হোক। যে শক্তির বলে গরীবের গতিমুক্তি হইবে, দুঃখীর মুখে অন্ন উঠিবে ও হাসি ফুটিবে, সে শক্তি ইংরেজের অনুগ্রহের দান হইতে পারে না,— সাধনা করিয়াই তাহা অর্জ্জন করিতে হইবে। সেই শক্তি যখন জাগিবে, সকলেই তখন মুক্তির পথ পাইবে। সেই পথে হিন্দু-মুসলমান উভয়ে একসাথে যাত্রী হইবে। হিন্দুকে ছাড়িয়া মুসলমান, অথবা মুসলমানকে ছাড়িয়া হিন্দু উদ্ধার পাইবে, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় এরূপ উদ্ভট কল্পনা পাগলেরই শোভা পায়। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, রাজনীতিক্ষেত্রে এই পাগলামীই আজ প্রবল হইয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে খাইবার ডাক পড়িল। যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করিয়া মুসলমান গৃহস্বামী আমাদের জলযোগ করাইলেন। স্পষ্ট বুঝিলাম, প্রতিবেশী হইয়া সুখে থাকিতে হইলে, এই আদান-প্রদানটুকু আমাদের চাই, অথচ আমরা তা পাই না। মহিষগোঠ গ্রামে এই হৃদয়বান্ সরলপ্রকৃতি গৃহস্থের ঘরে আজ তাহা পাইলাম বলিয়া, প্রথম পাওয়ার তৃপ্তিতে হিন্দু-মুসলমান আমাদের সকলেরই মুখচোখ আনন্দে ভরিয়া গেল।

রাত দুপুরের পর অন্ধকার মাঠের উপর দিয়া, তিল ক্ষেতের ভিতর দিয়া, তারপর নদী পার হইয়া আমরা ঘেসো গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম।

দশ

পরদিন সকালবেলা আমরা চরকা চালাইতেছি। পাঠশালার ছাত্র দুই চারিজন কেহ তকলী, কেহ বা চরকা লইয়া আমাদের সঙ্গে বসিয়া গিয়াছে। আগের দিনে ছাত্রের দল দূর হইতে উঁকি দিয়া গিয়াছে, কাছে আসিতে তাহাদের মন সরে নাই,—হয়ত বা অজ্ঞাতে তাদের মনের তলে এই আশঙ্কা জাগিয়াছে যে আমরা অচিরাৎ তাহাদের উপর গুরুগিরি সুরু করিয়া দিব, আর ভারি কথায়, এমন ভারি ভারি উপদেশ ঝাড়িতে থাকিব, যে তার ঝাপ্টা খাইয়া তাহাদের হৃৎকম্প সুরু হইবে। কিন্তু রাত পোহাইতেই দেখি আগল ঘুচিয়া গেল, চরকার গুঞ্জনে ছোট বড় আমাদের সকলেরই মনের সুর চমৎকার মিলিল। সুতাকাটা চলিতেছে।—ছেলেরা কেহ বা তুলা ধুনিতেছে, কেহ পাঁজ করিতেছে। উৎসাহ জমিয়াছে ভাল। সঙ্গে সঙ্গে—

"আপনার টেকোটা খারাপ।"

"বাঃ, ও কেমন সরু সুতো কাটছে।"

"তুই ঘণ্টায় কত গজ কাটিস্?"

"চা'রশ গজ।"

"চারশ গজ না হাতী, সেদিন ত গুন্‌লি, তিনশ সত্তর গজ হ'ল।"

"জানেন, আমাদের জামাগুলো সব নিজের হাতের সুতোয় বোনা,"—ইত্যাদি কত কথা, কত প্রশ্ন, সেই লঘু আনন্দের হাওয়ায় ভাসিয়া উঠিয়া তাহাদের সুকুমার মনে দোলা দিতেছে। আর সেই সঙ্গে আমাদের মনে গুঞ্জন চলিতেছে,—

"আপন হাতের জোরে
মোরা তুলি সৃজন করে,—"

এরা বিদ্যার্থী বালক, বাণী-মন্দিরের যাত্রী। আপন হাতের সৃষ্টির এই সার্থক আনন্দ থেকে যদি এদের পথযাত্রা সুরু হয়, আর সেই আনন্দকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া, নানা তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধানে যদি এদের মনের পরিধি ক্রমে বাড়িয়া চলে, তবে আনন্দে মা বীণাপানি এদের মনোবীণায় আপনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিবেন, আর সেই আনন্দের সুরে সুরে "শ্বেতপদ্মাসনার" আশিস্‌ধারা ইহাদের শিরে ঝরিয়া পড়িবে। বাণী-মন্দিরের এই ত রাজপথ। চিনিয়া, বুঝিয়া, সুকৌশলে এবং শ্রদ্ধাসহকারে এই ঋজুপথ ধরিয়া চলিতে পারিলে, "নিঃশেষজাড্যাপহা" সেই দেবী শৈশবেই বিদ্যার্থীর দেহ ও মনের সকল জড়তা নিঃশেষে দূর করিয়া দিয়া, তাহাকে এমন এক অপূর্ব্ব নবযৌবনের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন, যার বীর্য্য হইবে অমোঘ, সৌন্দর্য্য হইবে

অনুপম, মেধা হইবে শ্রদ্ধাসম্পন্না এবং সৃষ্টি হইবে কল্যাণমুখী,—যে 'জগদ্ধিতায়' আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারিবে। নবীন হইবার এই তপস্যাই ত আজ দেশকে করিতে হইবে।

আজ কেন এই ভাবনা, কিসের খেয়ালে কেন এই আকাশ-কুসুম রচনা, তা জানি না। এ কি কল্পনাবিলাস? হয়ত তাই, হয়ত বা নয়। কিন্তু বুড়া গান্ধীর ভিতর দেশের এই নব-যৌবন যে অপূর্ব্ব মহিমায় দীপ্যমান্ হইয়া, দিকে দিকে তার আলো ছড়াইয়া দিতেছে, একথা আজ অতি সত্য, পরম সত্য। এই যৌবনের স্বপ্ন দেখিয়া একদিন বাঙ্গালার নারী-কবি গাহিয়াছিলেন—

"আমি যৌবনের লাগি করিব তপস্যা ঘোর।"

—কিন্তু আজ কোথায় তপস্বী, কোথায় সুকঠোর তপশ্চর্য্যার সৌম্য নির্ম্মল জ্যোতিঃপ্রভা, কোথায় সেই যৌবনে বৈরাগীর দল, যাহারা দেশে নবযৌবন ও নবীন জীবন আনিয়া নব নব সার্থকতার পথ খুলিয়া দিবে! 'ধান ভানিতে শিবের গীত'—সকালবেলা কি হইল জানি না, চরকার সুরে সুরে এমনি করিয়া কোন্ অনাগত যৌবনের সন্ধানে মন ছুটিল। এমন সময় * * * দাদা আসিয়া বলিলেন, "আরম্ভ করে দাও ভাই, গরম গরম চাল-কড়াই ভাজা এনেছি।"

বাঁচা গেল, নিরালম্ব মনটা অবলম্বন পাইল। দাদার বাড়ীর চালভাজা আমাদের বড় মিষ্ট লাগে, তেলমাখা, গোটামাখা, তার উপর কাঁচালঙ্কা। কিন্তু ছেলেগুলোর কি লোভ,—ভাল করিয়া

খাইতে দিল না। অধ্যাপক-বন্ধু সঙ্গে জুটিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"দুপুর বেলা কি আয়োজন হচ্ছে * * * দা।"

"কি আর হবে ভাই, একটু মাছ পেয়েছি, আর দই, আম, রম্ভা আছে। এবার কাসুন্দীটা মজেছে ভাল।"

কাসুন্দীর নামে সত্য বলিতে কি জিহ্বায় জল আসিল।

গত আন্দোলনে দাদার জমিজমা সব গিয়াছে। দুঃখের বোঝার বাকি যেটুকু ছিল, যম তাহা পূরাইয়া দিয়াছেন। তবু কাজকর্ম্মে, শিবিরে-সম্মেলনে, সর্ব্বত্রই বিপুল পরিশ্রমের মাঝে তাঁর মুখের হাসি ও মনের উৎসাহ কখন কম দেখি নাই। দাদা বলিতে লাগিলেন, "খাওয়া-দাওয়ার কথা হচ্ছে ভাই,—তাই আজ হাবুর মাকে মনে পড়ছে।"

হাবুর মার নাম আমরা ত কতই শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁকে চোখে কখনও দেখি নাই। তাই দাদার মুখে তাঁর কথা শুনিবার বড় ইচ্ছা হইল। কৌতূহলী হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "বলুন না।"

তিনি তখন বলিলেন, "হাঁ, ছিল বটে সে আস্ত একটা মানুষ, চাষীর ঘরের মেয়ে হ'লে কি হয়।"

"কেন দাদা, চাষীর ঘরের মেয়ে বলতে আপনার কুণ্ঠা কেন?"

"না সে আর এমন কি। তবে কিনা, এই গরীবের ঘরের ত। অভাবের তাড়নায় সারাজীবন খেটেই গেছে, সুখের মুখ

কখন দেখতে পায়নি। তাই বলছিলুম আর কি—, আমাদের চাষীর ঘরের মেয়ে।"

"অর্থাৎ আপনি বলছেন,—তিনি মহিলা ছিলেন না।"

দলের ভিতর হইতে একজন চাষী বলিয়া উঠিল, "কি বল্লেন কথাটা গো, বুঝতে পারি না।"

"এমন কিছু নয় গো। আমি বলছিলুম মহিলা,—অর্থাৎ এই আমাদের এক ধরণের নভেল-পড়া, হাওয়া-খাওয়া, ঠাকুর-চাকর-গতি, আত্মপরায়ণা, অতি-সৌখীন আধুনিকা,—যাঁদের জন্যে সিনেমা-থিয়েটারে এবং ওরিয়েণ্টাল নাচের আসরে স্বতন্ত্র আসনের বন্দোবস্ত থাকে।"

অধ্যাপক হাসিলেন, আর চাষী ভাই আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "এইবার বলুন দাদা।"

দাদা বলিতে লাগিলেন, "সেই ১৯৩০ সালের কথা, সত্যাগ্রহ আন্দোলন তখন জোর চলেছে। আমরা * * * গ্রামের ক্যাম্পে আছি। শীতকাল। একদিন রাতদুপুরে, তোমায় বলবো কি, কম ক'রে অন্ততঃ ত্রিশজন ভলাণ্টিয়ার এসে হাজির,—সারাদিন তাদের খাওয়া-দাওয়া নেই। হাবুর মা রান্না-বান্না ক'রে, আমাদের খাইয়ে দাইয়ে, সবেমাত্র সেই নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছে, এমন সময় ছেলেদের এই কাণ্ড! বলবো কি ভাই, যেমন সে এসেছিল, অমনি সোজা রান্নাঘরের দিকে ফিরে গেল। একটু রাগ করলে না, একটু বিরক্ত হ'ল না।

তারপর আবার সেই রাতে রেঁধে বেড়ে হাসিমুখে সকলকে খাওয়ালে। যেন সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা।"

চাষী ভাই বলিল, "সে কথা আর বলতে। সেই যে সেবার যখন জেল থেকে ফিরে এলুম গো, মনে নেই। হাবুর মা আমাকে দেখতে পেয়ে কি বললে জান? বললে, অমুক মোড়ল, আজ তোমাকে আমার ওখানে খেতে হবে। গেলুম দুপুর বেলা। কি যত্ন করে খাওয়ালে দাদা,—পিঠে, পায়েস কত কি! খাবার সময় আমার কি মনে হচ্ছিল জান? মনে হচ্ছিল, কোন্ ছেলেবেলায় মা ম'রে গেছে,—আমার সেই মা আবার যেন জ্যান্ত হ'য়ে ফিরে এলো গো।" বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিল।

পল্লী-রমণী হাবুর মার নাম ছিল বরদাময়ী। বরদাময়ীর যখন মৃত্যু হয়, তখন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে মহাত্মাজী তাঁর কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে ম্যাক্‌সিম্ গর্কির সুবিখ্যাত 'মাদার' নামক পুস্তকে যে মায়ের পরিচয় পাই, হাবুর মা ছিলেন সেই জাতীয়া। তাঁর ছেলেটি হাবাকালা ছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'হাবুর মা' বলিত। হাবুর মার আসল জোর ছিল তাঁর স্নেহে ও সেবাপরায়ণতায়। ঐ ছিল তাঁর পুঁজি, ঐ সম্বল লইয়া তিনি জীবনে সার্থকতার পথ পাইয়াছিলেন। ছেলের দল 'স্বদেশী' করিবার জন্য একসঙ্গে জুটিয়াছে। তাদের রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ত চাই। তাই হাবুর মা সত্যাগ্রহ-শিবিরে আসিয়া হাঁড়ি ধরিলেন। অশিক্ষিতা রমণী,—

রাজনীতির কোন ধার ধারিতেন না। গৃহস্থ ঘরের আর পাঁচজন ভালমানুষ মেয়ের মত সাহসেরও তাঁর অভাব ছিল। কিন্তু হইলে কি হয়, ছেলের দলকে পাইয়া যে স্নেহ ও সেবার উৎস তাঁর মাতৃহৃদয়ে খুলিয়া গিয়াছিল, সেই স্নেহ ও সেবা ধীরে ধীরে সেই হৃদয়ের রূপান্তর ঘটাইল। ছেলেরা আইন অমান্য করিয়া মার খাইয়া আসে, কেহ বা ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িয়া ছটফট করে,—হাবুর মা মূর্ত্তিমতী করুণার মত তাদের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকেন। আর স্নেহের সেই সোনার কাঠি বাহিয়া ছেলেদের সাহস মায়ের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, ছেলেদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মায়ের হৃদয়ে স্বাধীনতার তরঙ্গ তুলে। তারপর, নির্য্যাতন যখন আসে, খানাতল্লাস ও ধরপাকড়ের ধুম পড়িয়া যায়, তখন দেখি, হাবুর মার স্নেহের সেই করুণ কোমলতা সাহসের দুর্ব্বার কাঠিন্যে রূপান্তরিত হইয়া তাঁহাকে নবীন গরিমায় মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। শেষে পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, দুইবার জেল দেয়। হাবুর মা হাসিমুখে কারাক্লেশ সহ্য করেন,—না করিলে চলে না, ছেলেরা যে জেল খাটিতেছে। এমনি করিয়া বরদাময়ীর নিঃস্বার্থ সেবা দেশপ্রেমের শতদল হইয়া ফুটিয়া উঠে।

এগার

অপরাহ্ণ বেলা,—রৌদ্রের তেজ কমিয়াছে। গ্রামের প্রান্তভাগে আমরা পথ চলিতেছি। বাঁধের কোলে খুব ঝোপ-জঙ্গল। তারপর সুমুখে মস্ত বড় একটা হানা। উঠা-নামা করিয়া হানার মুখ পার হইতেছি। হানার মুখ বর্ষায় বাঘের মুখের চেয়ে ভয়ঙ্কর,—তাই কাছাকাছি গরীব গৃহস্থ যে কয় ঘর ছিল, সকলেই বাস উঠাইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাদের মাটির ঘরদোর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, তাল পাকাইয়া, ঢিবি হইয়া পড়িয়া আছে,—আর তার উপর হা হা করিয়া ফিরিতেছে কি একটা অকরুণ শূন্যতা। সে যেন গৃহস্থালীর সকল আনন্দ নিঃশেষে গিলিয়া খাইয়াছে,—শিশুর হাসি, মায়ের কোল, সন্ধ্যাদীপ—সবই!

দূরে আকাশের কোলে বৃক্ষরাজির শ্যামকৃষ্ণ রেখা। তার অপর পার্শ্ব হইতে একটা সাঁই সাঁই শব্দ ছুটিয়া আসিতেছে। অধ্যাপক বলিলেন, "কি বিশ্রী আওয়াজ,—সন্ধ্যার আগে যেন একটা অলক্ষণ।"

সঙ্গী কৃষক একজন হাসিয়া বলিল, "অলক্ষণ কি গো! ওটা যে ধানকলের শব্দ।"

"ধান-কল? কিন্তু শব্দটা সত্যই বড় বিশ্রী ঠেকছে। মনে হচ্ছে, ভয়ঙ্কর একটা অজগর যেন আকাশে ছোবল মারছে।"

"এ যেন তার মরণ-রস পরিবেশনের অট্টহাস। দিগন্তের আকাশ তার বিষক্রিয়ায় ফ্যাকাশে নীল হ'য়ে উঠেছে।"

চাষী বলিল, "কি যে বলছ তোমরা, তার কিছু ঠিক পাই না। ধানের কলে ধান ভানা হচ্ছে, তার অজগরই বা কি, আর বিষই বা কোথায় ?"

অধ্যাপক বলিলেন, "তা বটে! গিয়েছিলে কখন ধানকল দেখতে ?"

"তা আর যাই নি ? কাজকর্ম্মের ফাঁকে সেথায় গিয়ে ত বসি।"

"কি দেখ ব'সে ব'সে ?

"কি দেখি ? সে আজব ব্যাপার। পাহাড়-প্রমাণ ধান চক্ষের নিমেষে ভেঙ্গে দিচ্ছে, অমন দুকুড়ি লোক সারাদিন খেটে যা পারে না।"

"কলের মালিক কারা গো ?

"ঐ যে, ঐ গাঁয়ের বিশ্বাসরা। বল্লে বিশ্বাস করবে না মশায়, কল ক'রে ওরা একেবারে লাল হ'য়ে গেল।"

"তা ত হবেই। কথায় বলে,—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। আর গরীব দুঃখী যারা ধান ভেনে খেতো, তারা গেল কোথায় ?"

"গেল কে কোথায় ছট্‌কে,—কে কার খবর 'রাখে মশায়। তবে হাঁ, আমার খিড়কীর বাগে থাকে সারীর মা। ছোট একটু কুঁড়ে, আহা স্বামী-পুত্তুর কেউ নেই। একটা মেয়ে ছিল।

তা সে পিলে জ্বরে ভুগে ভুগে শেষে উদরী হ'য়ে মারা গেল। মেয়েটাকে শ্মশানে রেখে এসে বুড়ীর কি কান্না! সে কান্না আজও থামলো না। তার ওপর পেটে খাওয়া নেই। খেতো ধান ভেনে, তা সে পাট ত চুকে গেছে।"

অধ্যাপক এই সহৃদয় চাষীর মুখপানে শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিতে লাগিল, "কে কা'র মুখ চায় মশায়। লোকে সস্তায় পায়, কলে গিয়ে ধান ভানিয়ে আনে।"

একটু অধীর হইয়া অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন, "সস্তা, সস্তা, সস্তা,—শুনে শুনে কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল। এদিকে সস্তার পথে মানুষের জীবন যে পোকামাকড়ের চেয়ে সস্তা হ'য়ে উঠলো।"

চাষী ঠিক কি বুঝিল জানি না। সে বলিল, "তা যা বলেছেন। সারীর মা বলে,—আমার এ জীবনে আর কাজ নেই। সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই খুঁটি ঠেক দিয়ে চাপাগলায় কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। আমার স্ত্রী চুপি চুপি চাল নিয়ে গিয়ে বলে,—দিদি দুটো ফুটিয়ে খাও। সারীর মা তার মুখের দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে, বলে,—এত লোকের মরণ হয় বৌ, আমার মরণ কেন হয় না ?"

উদাস হাসি হাসিয়া অধ্যাপক বলিলেন, "ভয় নেই সারীর মা। নাগপাশে জড়িয়েছে, ক'সে চেপে ধরেছে। একটু ধৈর্য্য ধর, মরণ তোমায় ফাঁকি দেবে না।"

ক্রমে আমরা মাঠে আসিয়া পড়িলাম। তেপান্তরের মাঠ। চাষীরা পাটক্ষেতে নিড়ানী দিতেছে। নিড়ানী তিনবার হইয়া এই চারবার চলিতেছে। এবার পাট চাষের খুব ঘটা। সরকার পাটচাষ বাঁধিয়া দিবে,—তাই সকলেই পাটের জমি বেশী করিয়া দেখাইতেছে। যে যে-পরিমাণ জমিতে পাট বুনিবে, বাঁধাচাষে তার জমির বরাদ্দ সেই অনুপাতে হইবে।

পথ চলিতে চলিতে অধ্যাপক বলিলেন, "এই পাটচাষ ব্যাপারটা কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগে না।"

"কেন?"

"এ যেন অদৃষ্টের পরিহাস! এর মধ্যে বাঙলার দেশজোড়া ব্যর্থতা আমি দেখতে পাই। বাঙলার ধানে আছে লক্ষ্মীর আবাহন, কিন্তু পাটের মধ্যে শুধু সোনার নেশা।"

"কি রকম?"

"পণ্ডিতরা অবশ্য মাথা নেড়ে বলবেন,—না। কিন্তু প্রবীণ একজন চাষীর মুখে যা শুনেছি, তা খাঁটি সত্য ব'লেই আমার মনে লাগে। কথায় কথায় একদিন সেই চাষী চোখ বুজে মাথা নেড়ে বলেছিলেন,—জানেন মশায়, লক্ষ্মী-স্থাপনা হয় ধানে,—ধান দিয়েই আমরা লক্ষ্মী পাতি। হিন্দুরা তাঁর পূজা করে, মুসলমান মেঠো সুরে মিঠে গলায় লক্ষ্মীর গান গেয়ে বেড়ায়। কিন্তু লক্ষ্মীপূজার পর অলক্ষ্মী বিদায় করা হয় পাঠের কাঠি জেলে। পাটে আমাদের সোনার নেশা, তাই তার ভিতর অলক্ষ্মীর বাসা।"

সঙ্গী একটু হাসিয়া বলিলেন, "শুনি তারপর।"

অধ্যাপক বলিতে লাগিলেন, "অর্থশাস্ত্রে হয়ত মিলবে না, তার বুলি আলাদা। তবু বলি। আমাদের এই পরাধীন গরীব জাতটাকেও সোনার নেশায় পেয়েছে। কবে কোন্ সনে পাটের দাম উঠেছিল,—চাষী দুপয়সা পেয়ে বাস্তভিটার মাথায় বাহাদুরী ক'রে বিলাতী টিন চাপিয়ে, সেখানে কারখানা-ঘরের শ্রীহীনতা আমদানী করেছে। তারপর সেই নেশার ঝোঁকে কোথাও এক-কোমর, কোথাও বা একবুক জলে দাঁড়িয়ে, অসীম ধৈর্য্যে, অপরিসীম কষ্ট সহ্য ক'রে, অসহ্য ও অবর্ণনীয় দুর্গন্ধের মধ্যে বছর বছর পাট কেচে চলেছে। শাস্ত্রীরা অঙ্ক ক'ষে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে পাটের চাষে তাদের সোনার নেশা সফল হতে চলেছে, চাষীর লাভের অঙ্ক ক্রমেই ভারী হচ্ছে। কিন্তু গ্রামে ও পথে স্থূল চক্ষে যা দেখছি, তাতে ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ছাড়া ত আর কিছু পাই না।"

"কি রকম ?"

"সোনার শরতে শুনেছি নাকি বাঙলার জলে জলে পদ্ম, আর পদ্মে পদ্মে ভ্রমর। কিন্তু গ্রামে ও পথে আসলে যা দেখি, সে ত জলে জলে পাট, আর পাটে পাটে পচানি,—সর্ব্বত্র নরক-কুণ্ড, লক্ষ্মীছাড়া দশা। অস্বাস্থ্য, দারিদ্র, আর শ্রীহীনতা পাটের সাথী হয়ে, পাটেরই মত বাঙলার একচেটিয়া হয়ে উঠেছে।"

"আর পাটের দর ?"

"সে ত মালিক মহাশয়দের হাতে। সে হাতের কৌশলের

কাছে যাতুকরও হার মানে। তারই কৌশলে পাটচাষীর সোনার নেশা এত মনোহরা হয়ে আছে। এদিকে শতকরা তিন শ' টাকা মুনাফায়ও মালিকের রাক্ষসী তৃষা মিটছে না।"

অধ্যাপকের কথাগুলি কেমন যেন অদ্ভুত লাগিল। ঠিক যে বুঝিলাম, তা নয়, কিন্তু মনে গিয়া বাজিল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "আর ফসলের রাজ্যে পাটটা কি জানেন ত ?"

"ঠিক ত জানি না। মরীচিকা না কি ?"

"হতে পারে। কিন্তু আমি বলি ইম্পিরিয়ালিজমের চর।"

"উঃ, একবারে খাঁটি পলিটিক্স্ যে! ই-ম্পি-রি-য়া-লিজমের চর,—চমক-লাগানো কথা বটে।"

"শুধু চমক-লাগানো কথা কেন ? দেখুন না, সুসভ্য বিংশ শতাব্দীতে যত সাম্রাজ্যবিস্তার তত বাণিজ্যবিস্তার, আর যত বাণিজ্যবিস্তার তত শোষণ, তত পরস্বাপহরণ।"

"কিন্তু বেচারী পাট তার চর হয় কি ক'রে ?"

"দশচক্রে ভগবান ভূত,—তার পাটের কথা কি আর বলছেন মশায়।"

"বুঝলুম না।"

"বুঝলেন না ? বস্তাবন্দী, বস্তাবন্দী! যত পরধন সব পাটের বস্তায় বন্দী হয়ে, রেল-ইষ্টিমারে চ'ড়ে হু হু ক'রে বুদ্ধিমানদের ঘরে গিয়ে উঠছে। আমদানী-রপ্তানীর এমন অদ্ভুত বাহন আর দ্বিতীয়টি পাবেন না। এখানেও ঐ সোনার নেশা।"

"তা বটে।"

"আর ঐটেই ত হ'ল শোষণের শ্বাস-প্রশ্বাস,—ঐ আমদানী-রপ্তানী,—ঐ সুসভ্য, মার্জ্জিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত লুটপাট। পাঁচ বুদ্ধিমানের চক্রে প'ড়ে পাট আজ জন্ম থেকেই এর চর হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

অধ্যাপক চুপ করিলেন। তাঁহার মুখে বাঙলার পাটের সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যর্থতার এই অদ্ভুত কাহিনী সেদিনকার ম্লান সন্ধ্যার সঙ্গে বড় মিলিল।

বাবু

আকাশে শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ। আধফোটা জ্যোৎস্নায় অব্যক্তের ইঙ্গিত। আটপৌরে মনে জানি না কখন উৎসবের ধুম লাগিয়াছে,—চোখে শুধু পথচলার নেশা। কৌমুদীস্নাতা প্রকৃতি মায়াময়ী, ছায়াময়ী, রহস্যময়ী। অবারিত প্রান্তরের উপরে পায়ে-চলা পথটি আঁকা-বাঁকা হইয়া পড়িয়া আছে,—সে যেন বৈরাগীর একতারার সুর। আর অদৃষ্ট কোন্ পথচারীর স্তব্ধ সঙ্গীত তরল জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইতেছে—

"বাজিয়ে চলি পথের বাঁশী,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙ্গীন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।"

ক্রমে মাঠ প্রায় পার হইয়া আসিলাম। সুমুখে তালপাতায় ছাওয়া একখানা সামান্য কুটীর। আঙ্গিনা হইতে কে বলিল, "এই উঠান দিয়ে যাও বাবা, পাশের পথটা বড় খারাপ।"

কৌতূহলী হইয়া চাহিয়া দেখি একজন স্ত্রীলোক। সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?"

সে বলিল, "এরা ডোম, গ্রামের বাহিরে এইখানে থাকে।"

কথা কহিতে কহিতে তার ক্ষুদ্র উঠানটুকু পার হইয়া আবার পথে পড়িলাম। পিছন হইতে স্ত্রীলোকটি আগ্রহের স্বরে বলিল, "আমার জামাই এসেছে গো বাবা ঠাকুর।"

ফিরিয়া চাহিলাম, ভদ্রতা করিয়া বলিলাম, "তোমার জামাই এসেছে, আহা বেশ বেশ।"

তখন নন্দিত উৎসাহে সে বলিল, "একবার দেখে যাবে না গা তোমরা, আমার জামাইকে।"

অপরিচিতা প্রৌঢ়ার এই আগ্রহ উপেক্ষা করিবার নয়। আমরা ফিরিয়া পুনরায় আঙ্গিনায় আসিয়া উঠিলাম। মিষ্টস্বরে বলিলাম "কোথায় গো, জামাই কোথায়?"

তখন কুড়ি একুশ বৎসরের এক স্বাস্থ্যবান্ যুবক আসিয়া আমাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। বেশ মুখখানি,—পরিচ্ছন্ন,

উজ্জ্বল, প্রফুল্লতাময়। তার বিনত মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার সময় আমাদের জাত-বামুনের মন কি এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। নিশ্চিত জানি, এইরূপে প্রণাম লইতে আমাদের আগ্রহ কখনও নাই, আছে বরং বিরক্তি, অস্বস্তি অথবা উদাসীনতা। তথাপি সেই চন্দ্রিকাস্নিগ্ধ কুটীরাঙ্গনে এই প্রণাম-আশীর্ব্বাদের পালাটুকু এতটুকুও অস্বাভাবিক বলিয়া ঠেকিল না। মনে হইল, আজ রাত্রির প্রথম যামে, আশীর্ব্বাদ করিবার এই সহজ সুযোগ যেন ভাগ্যে মিলিয়াছে। আশীর্ব্বাদের ছলে আজ যেন কত যুগের ঋণ-স্বীকার করিয়া বাঁচিতেছি, আর মনে মনে বলিতেছি, —ওগো চির-অনাদৃত, গ্রহণ কর আমাদের,—এই দেখ, জাতের বড়াই ফেলিয়া, মিথ্যা আভিজাত্যের হীন কলুষিত অভিমান ছাড়িয়া, রিক্ত হইয়া আজ তোমার অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

একটি মেয়ে কুটীর-দ্বারের আড়ালে থাকিয়া সন্তর্পণে আমাদিগকে দেখিতেছে। দীন-দরিদ্রের কুঁড়ে ঘরে আজ সত্যই আনন্দ। প্রৌঢ়া ডোম-রমণীর মাতৃহৃদয় আজ উল্লসিত, উদ্বেলিত।

ইঁহাদের ঘর হইতে বিদায় লইয়া, আমরা আবার পথ চলিতে সুরু করিলাম। আকাশে চাঁদ। গ্রামপথে বৃক্ষরাজির তলে তলে আলোছায়ার বিচিত্র জালে কি ইন্দ্রজাল রচিত হইয়াছে। দূরে খোল বাজাইয়া কাহারা হরিনাম করিতেছে। পথের দক্ষিণে, মাঠের মাঝে বিশাল এক বটগাছের ধ্যানস্তিমিত, মহিমান্বিত শুদ্ধ শ্রী চিত্তের গভীর গোপন তলে সুন্দরের শতদল

সৃষ্টি করিতেছে। তালদীঘির কালো জল চাঁদের আলো বুকে ধরিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত। অভ্রভেদী তালগাছের মাথায় মাথায় তরল জোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রকৃতির এই ভাবময়ী, হাস্যময়ী, কল্যাণময়ী মূর্ত্তির কাছে একটিবারও নিজেকে নিঃশেষে ছাড়িয়া দিতে পারিলে মানুষ যেন নূতন করিয়া আপনার পরিচয় পায়।

ক্রমে লোকালয়ে আসিয়া পড়িলাম। এখানে ওখানে দুই একটা হারিকেন জ্বলিতেছে। দরজীর দোকানে সেলাই-কলের শব্দ, তাসের আড্ডায় যুবকগণের উচ্চহাসি। রাস্তার একটা মোড় ফিরিয়া আমরা অবশেষে * * * ম'শায়ের আস্তানায় আসিয়া উঠিলাম। তিনি তখন বিস্তৃত উঠানের মাঝখানে এক মাচার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া চন্দ্রালোকে দক্ষিণা হাওয়া খাইতেছিলেন। আমাদের এই হঠাৎ আবির্ভাবে মাচার মালিক লাফাইয়া উঠিলেন এবং ঝাঁপাইয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। ভাবিলাম, অতঃপর গান ধরিয়া বুঝি বা আমাদের অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু তিনি ততদূর আর অগ্রসর হইলেন না,—উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন "আসুন, আসুন, আমাদের দুয়াদণ্ডে থেকে দুদিন দণ্ড-ভোগ করে যান।"

* * * মশায় ভবঘুরে মানুষ,—সেপাই হইয়া গত যুদ্ধের সময় ইরাক্-তুরাকে কতদিন কাটাইয়া আসিয়াছেন। আর নিজদেশে পদব্রজে কাশী-কানপুর,—এমন ত হইয়াই থাকে। তাঁহার পক্ষে আরামবাগের খাদিকেন্দ্র আগলাইয়া এই

দুয়াদণ্ড গ্রামে বসিয়া থাকা মাঝে মাঝে অস্বস্তিকর হইতেই পারে। কিন্তু কর্ম্মী জানেন, গ্রামের কাজ সর্ব্বত্রই কি বিপুল ধৈর্য্যের অপেক্ষা রাখে।

কথাবার্ত্তায় অনেকক্ষণ কাটিল। তারপর এক বন্ধুর বাড়ী হইতে আহার্য্য সামগ্রী আসিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া মাচার উপর গিয়া বসিলাম। বাব্‌লা গাছের পিছনে পঞ্চমীর চাঁদ অস্ত গেল। আমরা তখন মশারি টাঙাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালবেলা সুতা কাটিতেছি। একজন স্ত্রীলোক ডাকিল, "হাঁ গা বাবা।"

মুখ তুলিয়া বলিলাম, "কি গা।"

"তুলো এসেছে কি গা বাবা?"

"হাঁ গো এসেছে।"

শুনিয়া তাহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল।

"এখনি আসছি বাবা, একটু ঘুরে" বলিয়া সে চলিয়া গেল। তারপর একজন, দুইজন করিয়া আসিতে লাগিল। সকলেই স্ত্রীলোক, সকলেই গরীব, সকলেই তূলার খোঁজে। সকলেরই পরণে ময়লা ছেঁড়া কাপড়, সকলেরই রুক্ষ কেশ, মলিন মুখ। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ইহারা সকলেই মুসলমানের ঘরের। একটি ছোট মেয়ে,—বয়স নয় কি দশ বৎসর, বড় লাজুক। নিজ হাতে কাটা সূতার গোছা কত যত্ন করিয়া আঁচলে বাঁধিয়া আনিয়াছে। সম্মুখে তূলার বস্তার দিকে চাহিয়া তাহার বড় বড়

চোখ দুটি আনন্দে টল টল করিতে লাগিল। একজন বৃদ্ধা আসিল সকলের শেষে। বলিল, "আহা বাবা, তূলো এসেছে শুনে এলুম।"

"ব'স বাছা। তোমার ঘরে কে আছে?"

"কেউ নেই বাবা, আমার পোড়া কপাল।"

"ছেলে-পুলে, আপনার জন কেউ নেই?"

"না বাবা, না। স্বামীপুত্তুর নেই, আপনার বলতে কেউ নেই। একটা গরুবাছুরও নেই। তোমরা যা এই তূলোটুকু দাও,—তাই সুতো কেটে আনি। আর দু'এক পয়সা মজুরী যা পাই, তা'তে কোনমতে পেটটা চ'লে যায়। তোমরাই ভরসা গো, বাবাঠাকুর।"

ইহাদের সকলকেই একে একে তূলা ওজন করিয়া দেওয়া হইল। সুতা-কাটার মজুরী যার যাহা পাওনা খুসী হইয়া লইয়া গেল। মজুরীর পয়সা হইতে দু'পয়সার তেল, আধ পয়সার নুন, এক পয়সার কেরোসিন,—এই সব কেনা-কাটা করিয়া ইহারা ঘরে ফিরিবে। সপ্তাহে চারটে ছ'টা পয়সা মজুরী লইবার জন্য ইহারা বর্ষাকালে এক-কোমর জল ভাঙ্গিয়া আসে। ইহার অভাবে এদের দিনযাত্রা অচল।

স্ত্রীলোকেরা একে একে চলিয়া গেল। অধ্যাপক তখন বলিলেন, "কূট তর্ক ছেড়ে, পণ্ডিতের দল যদি পল্লীতে এসে এই সব অসহায়দের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দ্দশা একবার চোখে দেখে যান,

তা'হলে হয়ত চরখা ও খাদির প্রতি তাঁদের একটু দরদ হ'তে পারে।"

সঙ্গী বলিলেন, "আসল কথাই ত তাই। সর্ব্বহারাদের প্রতি যদি সত্যিকার দরদ থাকে, তাহ'লে ত খাদির প্রতি দরদ আপনিই হয়। কিন্তু সে দরদ কোথায় ?"

ঠিক কথা। ফাঁকি ত এইখানেই। দেশের লোকের প্রতি আমাদের দরদ যে আজও প্রায় পুঁথিগত। ভালবাসা যদি সত্যই হৃদয়গত ও কর্ম্মগত হ'ত,—**they are the very fibre of my being'**—গান্ধীজীর এই 'লক্ষ কবির ঘন অনুভূতিযোগে' ভালবাসার কণামাত্রও যদি আমরা পেতুম, তা'হলে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, নিয়ে শুধু কবিতা লিখে আর গান গেয়ে, আমরা কর্ত্তব্যের শেষ করতুম না,—তাকে সত্যই 'মাথায় তুলে' নিতুম। কিন্তু নিরন্নের চোখের জলে হৃদয় যে আমাদের গলে না।"

"শুধু কি তাই ? আমরা পরদেশী থিওরীর ভূত ঘাড়ে ক'রে বেড়াই, নিজের দেশের বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃক্‌পাত করবারও অবসর আমাদের নেই। মনের পরাজয় আর কা'কে বলে ? আমরা অধিকার অধিকার ব'লে চীৎকার করি, কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বানে যদি কেউ অবহিত হ'তে বলে, অমনি তাকে ধিক্কার দেবার জন্যে শাণিত জিহ্বা দিয়ে শব্দের ঢেউ তুলতে থাকি। আমরা গণবিপ্লব চাই, কিন্তু ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামে যে জনগণ আছে, তাদের বাস্তব অবস্থার সর্ব্বাঙ্গীণ জ্ঞান-আহরণের

সাহস বা ধৈর্য্য আমাদের নেই। আমাদের রাজনৈতিক চেষ্টা বাস্তববোধ-শূন্যতার পাষাণে ঠেকে তাই ব্যর্থ হচ্ছে।"

কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। তারপর * * * মশায় উঠিয়া রান্নাঘরে গেলেন। আমরা স্নান সমাপন করিয়া তাঁর হাতের রান্না ভাত তরকারীর সদ্ব্যবহার করিলাম।

তের

দুয়াদণ্ডে দু' তিনটা দিন কাটিল। তারপর এক সকালে রওনা হইয়া পড়িলাম। রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড বড় এক দীঘি, চারিদিকে উঁচু পাড়। বহুকাল ধরিয়া সংস্কারের অভাবে দীঘির তলদেশ ক্রমে ভরাট হইয়া উঠিতেছে,—তার একদিকে চাষও সুরু হইয়াছে। দীঘি ত এমন এক-আধটা নয়, এই অঞ্চলের সর্ব্বত্রই এরূপ বড় বড় জলাশয় আজও গ্রামের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ কোনও মতে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। পথে কয়জন লোক যাইতেছিল,—তাহাদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ দীঘি কত কালের গা?"

একজন উত্তর দিল, "কত কালের তার কি কিছু ঠিক আছে মশায়।"

"আচ্ছা, এমন দীঘি ত এখনকার দিনে আর হয় না।"

"কি ক'রে হবে মশায় ? এ সব হ'ল সাবেক কালের দীঘি—'পিচাশের' হাতে কাটা ! এখনকার দিনে কি আর এ সব হয় ?"

ভারি অদ্ভুত কথা,—'পিচাশের' হাতে কাটা ! সেকালে বড় বড় দীঘি কাটিবার জন্য গ্রামে গ্রামে ভূত-পিশাচে আসিয়া ভিড় করিত, এ সব তাদেরই হাতের কাজ, মানুষের হাতের নয়,—দিব্য সহজ বিশ্বাসে এই কথা বলিয়া দিয়া তাহারা অন্যদিকে চলিয়া গেল। আমরা ত শুনিয়া অবাক্ !

অধ্যাপক বলিলেন, "আবার এখান থেকে তিন চার ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে লোকে কি বলে জানেন ?"

"কি বলে ?"

"বলে, এই সব বড় বড় দীঘি অসুরে কেটেছে।"

"সে একই কথা, পিশাচ অথবা অসুর,—যারা এই মানুষ-গুলোর কেউ নয়, যাদের সঙ্গে এরা বংশ বা শোণিতের সম্পর্ক দাবী করবে না।"

একদা এই সব সুবৃহৎ জলাশয় খনন করা যাহাদের উদ্যোগে সম্ভব হইয়াছিল, তাহারা দেহে অসুরের শক্তি ধরিত সন্দেহ নাই। সেই সকল বলশালী মানুষের মগজে ছিল সত্যকার পদার্থ, আর মনে ছিল সাহস ও তেজ। সমাজের ভালমন্দের দিকে তাহাদের কল্পনা খেলিত, বহুজনকে লইয়া তাহাদের কারবার চলিত। কিন্তু তাহারা যে এই গ্রামবাসীদেরই পিতৃপিতামহ ছাড়া অপর কেহ নয়, এই সাদা কথাটা শতাব্দীর মধ্যে ইহাদের মন

হইতে সরিয়া গিয়াছে। তিন চার পুরুষ ধরিয়া রোগে ভুগিয়া, আধপেটা খাইয়া, ছেঁড়া কাপড় পরিয়া, মানুষ বলিতে ইহাদের আর কিছু নাই। দুর্ব্বলের ধর্ম্ম আজ ইহাদের দেহে মনে সুপরিস্ফুট। বিদেশী শাসনের সর্ব্বব্যাপী চাপে ইহাদের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন একেবারে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে,—নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়া, একান্ত অসহায়তার মধ্যে ঐ শাসনটার পায়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া লুটাইয়া পড়া ছাড়া ইহাদের যেন আর গতি নাই। এদিকে দেশের শ্রীমান্ ও বুদ্ধিমানদের কাছে ইহারা ছোট লোক। ক্বচিৎ 'ভোটের' সময় হয়ত 'আপনি' সম্বোধন ইহারা পায়, দুটা মিষ্ট কথাও শুনে। কিন্তু বাপের ঠাকুর হইয়া 'ভোট' দিবার পর, রাত না পোহাইতেই ইহারা পথের কুকুরের সামিল হইয়া যায়। ইহারা আশা, ভরসা, ভালবাসা কোথাও পায় না, কিন্তু জমিদার, দারোগা, মহামারী ও অজন্মার ভয়ে সর্ব্বদাই ইহাদের সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। সুতরাং কোনও কালে কোনও পুরুষে যে ইহাদের কেহ শক্তিমান্ ছিল, বৃহৎ কল্পনা লইয়া বৃহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিত, জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই সে কথা ভাবিতে ইহারা ভরসা পায় না। পল্লীগ্রামের এই হতভাগ্যেরা সত্যই "মূঢ়, ম্লান, মূক,"—সত্যই ইহারা "শ্রান্ত, শুষ্ক, ভগ্ন"।

মাঠ পার হইয়া ক্রমে আমরা একখানি গ্রামের নিকট আসিলাম। অল্প উঁচু একটা বাঁধের উপর দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিবার পথ। গাছপালা, বাঁশবন এত ঘন যে দিন-দুপুরে

সেখানে রৌদ্র আসিতে পায় না। পথের ধারে ধারে সরাসরি লম্বা অপ্রশস্ত জলাশয়। জলের উপর ঝুলের মত একটা পুরু স্তর পড়িয়া আছে। আর রাস্তার ঠিক দুই পার্শ্বে কি ভয়ঙ্কর নোংরা করিয়া রাখিয়াছে,—দুর্গন্ধে নাক জ্বলিয়া যায়। মল ছুঁইলে হয়ত স্নান করিয়া শুচি হওয়াই বিধি, কিন্তু এই বিশ্রী দৃশ্যটা যেখানে সেখানে নিত্য সৃষ্টি করিয়া, যখন তখন তাহা চোখে দেখিতে অথবা নাসিকায় তার নানা অবস্থার ঘ্রাণ লইতে কাহারও বড় ঠেকে না। তাই সর্ব্বসমেত এই জায়গাটায় এমন কাণ্ড হইয়া আছে যে দেখিলে মন অবসন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মনে হয়, জাতিটা যেন দেহে মনে রোগগ্রস্ত হইয়া শেষের দিনের অপেক্ষায় রহিয়াছে। অপরিসীম দুঃখে অধ্যাপক বলিলেন, "এই ত বিষ-বৃক্ষের চরম ফল, পরাধীনতার মর্ম্মান্তিক দণ্ড। চেয়ে দেখুন, এ যেন কোন্ রাক্ষসীর বীভৎস হাঁ,—দেশের স্বাস্থ্য, শক্তি, আনন্দ, যৌবন, সবই গিলে খাচ্ছে। মুক্তির পথ কি খুলবে না?"

অধ্যাপক জানেন দেশের মুক্তির পথ নিজের জোরেই খুলতে হয়। কিন্তু ব্রতধারীর নিষ্ঠা লইয়া সেই সাধনায় সত্যভাবে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন কর্ম্মী আজও আঙ্গুলে গণা যায়,—দুঃখ ত এইখানে। জানেন যাঁহারা, বুঝেন যাঁহারা, তাঁহারা সত্যভাবে অনুভব করেন না, সংশয়ের দ্বিধায় তাঁহারা পঙ্গু, অথবা বুদ্ধিভেদের চপলতায় বলহীন। তাঁদের জাগ্রত হিসাব-বুদ্ধি নিজের বোঝা ভারী করিয়াই রাখে,—হিসাব-ভুলের নির্ভুল পথের ঠিকানা তাঁদের কখনও হয় না। ঝাঁপ দিয়া পড়িবার দুর্ব্বার আনন্দ ও অখণ্ড

বিশ্বাস তাঁহাদের নাই। তথাপি এই ঘনান্ধকারে একটিমাত্র দীপশিখা যেখানে সত্যভাবে জ্বলিয়াছে, আজ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাকে দীপ্ত রাখিতে হইবে। একটি স্ফুলিঙ্গ হইতেই ত মহাগ্নির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

আরও দেড় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আমরা অবশেষে ধান্যঘোরী গ্রামে আসিয়া পৌছিলাম। গ্রামের কোলে প্রায় আধ মাইল ব্যাপী একটা হানা। হানা পার হইয়া উঠিয়া দেখি, এক নাটমন্দিরে পাঠশালা বসিয়াছে। অনেকগুলি অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রী খুব মনোযোগ সহকারে পড়িতেছে। এই পাঠশালা স্থানীয় কর্ম্মীদের তত্ত্বাবধানে চলে। তাঁহাদের চেষ্টায় ইহার একটি নিজস্ব বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে। পাঠশালা দেখিয়া আমরা এইস্থানের * * * মহাশয়ের বাটিতে আসিলাম। ইনি একজন পুরাতন কংগ্রেসসেবী,—কাজের মানুষ, বিচারশীল ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ।

পরম সমাদরে তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। রূপ-নারায়ণের বাঁধের উপর তাঁহার ঘর। স্থানটি বড় মনোরম। চারি-দিক উন্মুক্ত, বেগে বায়ু বহিতেছে, দূর পাহাড় অঞ্চলে নিশ্চয়ই কোথাও বৃষ্টি হইয়াছে,—তাই নদীর জল এখন লাল। নদীজলে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে। ছোট ছোট পানসীগুলি আরোহী লইয়া অথবা মাল-বোঝাই হইয়া, হেলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মানুষের জীবনের এই ব্যস্ততা, এই চঞ্চলতা ও আনন্দ দেখিয়া সকাল বেলাকার অবসাদ কাটিয়া গেল।

নদীতে নামিয়া স্নান করিলাম। আহার ও বিশ্রামের পর

গ্রামের অভিমুখে চলিলাম। প্রথমে একখানা বড় মাঠ। হানার মুখে বালি উঠিয়া মাঠে চাষবাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—এখন মাঠের চেয়ে ইহাকে বরং এক টুকরা মরুভূমি বলিলেই ঠিক হয়। পথের সঙ্গী এক জন বলিল, "একি সোজা মাঠ ছিল মশাই,—বলে, কাটা মাথা ফেলে দিলে গজিয়ে উঠতো, এমনি মাটির তেজ।"

দুই হাত প্রসারিত করিয়া সে আবার বলিল, "এই যে দেখছেন,—ডাইনে বাঁয়ে এখানে সব সোনা ফ'লতো। কিন্তু হানা প'ড়েই সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। ভগবানের মার, কে রক্ষা করবে?"

রক্ষা যে করা যায় এবং তার শক্তি যে ভগবান্ মানুষের হাতেই দিয়াছেন, ইহা হয়ত বিচার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু আশু প্রতিকারের অভাবে যারা নিত্য দুর্ভোগ ভুগিতেছে, বিচার তাদের কাছে সকল সময় রুচিকর হয় না! তথাপি দুঃখের জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া ইহারা বুঝিয়াছে যে বর্ত্তমান অবস্থার একটা ওলটপালট না হইলে বাঁচিবার আর পথ নাই।

অধ্যাপক বলিলেন, "এই ত, যেখানেই যাঁই, দেখি দেশময় ক্ষুধার আগুন জ্বলছে। ইতিহাসের অনিবার্য্য গতি যদি তাই-ই হয়, তবে এ ক্ষুধার আগুন বিপ্লবের আগুন হ'য়ে জ্বলে উঠছে না কেন?"

কর্ম্মী উত্তর করিলেন, "ক্ষুধার আগুনে এই ভাগ্যহত দেশে ক্ষুধার্ত্তই শুধু পুড়ে ছাই হচ্ছে। বিপ্লব কি আপনি জাগে? তাকে যে জাগিয়ে তুলতে হয়। ইতিহাসের গতিই যাদের একমাত্র ভরসা, হাত পা গুটিয়ে তারা পাণ্ডিত্যের অভিযান চালাক্, যতদিন না শ্মশানে এই জাতিটার সদ্গতি ঘটে।"

অধ্যাপক বলিলেন, "সত্যই তাই। শতকরা নব্বই জন লোক যে দেশে গ্রামে বাস করে, তাদের নিত্য অভাবের মধ্যে বিপ্লবের সমিধ্-সংগ্রহ হচ্ছে সন্দেহ নেই,—কিন্তু আজ কোথায় সেই কর্ম্মীর দল, যারা দেশের এই বাস্তব অবস্থার মধ্যে বাসা বেঁধে, দুঃখীর প্রাণে দোলা দিয়ে যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়ে তুলবে?"

"তাই ত অহিংস বিপ্লবের পন্থা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে গান্ধীজী বার বার কর্ম্মিগণকে গ্রামের দিকে আহ্বান করছেন।"

ধান্যঘোরী গ্রাম দেখিয়া আমরা বন্দরে আসিলাম। বন্দর রূপনারায়ণের তীরে। এখান হইতে একটু উপরে শিলাবতী ও দ্বারকেশ্বরের সম্মিলিত স্রোতে রূপনারায়ণের উৎপত্তি হইয়াছে। এককালে এই স্থান এই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। কিন্তু আজ শিল্প ধ্বংস হইয়াছে, তাই ব্যবসা যা আছে তা নামমাত্র। রূপনারায়ণের উপর বন্দরের বাঁধাঘাট, পার্শ্বে পুরাতন নীলকুঠীর প্রকাণ্ড শূন্য অট্টালিকা, আর আকাশে চাঁদ। নীলকুঠীর সুবিস্তৃত অঙ্গনে গ্রামবাসিগণের একটি সভা বসিয়াছে। গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তি অনেকেই আসিয়াছেন। কয়েকজন কংগ্রেস-কর্ম্মীও সভায় যোগ দিয়াছেন। সভার আলোচ্য ব্যাপার ছিল পাঠশালার নূতন গৃহনির্ম্মাণ। আলোচনা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলিল। মনে হইল, একযোগে কাজ করিবার জন্য ইহাদের মন অনুকূল হইয়াছে। সভা শেষ হইলে বাঁধের উপর দিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম,—চন্দ্রালোকে রূপনারায়ণের তখন কি মধুর রূপই হইয়াছিল।

চৌদ্দ

গ্রামের নামটি বেশ,—সাবলসিংপুর। সম্প্রতি এখানে একটি চরকা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সম্পর্কে এই গ্রামে আমাদের আসা। অপরাহ্ণ বেলা, সূর্য্য অস্তগামী। কিছুক্ষণ আগে ঝড় হইয়া বেশ এক পশলা বৃষ্টি ঢালিয়াছে। ঈশান কোণে বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘ এখনও পুঞ্জীভূত। নিদাঘক্লিষ্ট বৃক্ষলতা নবজল-ধারায় সিক্ত, তার উপর অস্তসূর্য্যের শেষরশ্মি-সম্পাত হইয়াছে,—সুমুখের ছোট মাঠখানির পারে তাই গাছে গাছে রূপের কি অপরূপ ছটা! এদিকে চাষী গৃহস্থের বহির্বাটীতে আমরা অতিথির দল বেশ জমিয়া বসিয়াছি। সন্ধ্যার সুখস্পর্শ সিক্ত বায়ু, আর মাঝে মাঝে মেঘের গুরু গুরু ডাক,—বর্ষার আগমনী আজ সকলের মনে নূতন সুর তুলিয়াছে।

আমরা নিম্নসমতলবাসী। নববর্ষার মেঘসমাগমে ঘনবনে ময়ূরের কেকাধ্বনি কেমন করিয়া পর্ব্বতগাত্রে, কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া আনন্দ-চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়, আমরা তা জানি না। আমরা জানি, আমাদের বাঙলার এই অবারিত মাঠের উপর বর্ষার নবমেঘমালার ছায়া যখন নিবিড় হইয়া নামে, আর কালো আকাশের কোলে বলাকাশ্রেণী শুভ্র উত্তরীয়খানির মত লঘু আনন্দের তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন তাপদীর্ণ প্রান্তরে

প্রিয়সমাগমের সে অধীর প্রতীক্ষা কেমন করিয়া আমাদের মনকে ঘরছাড়া করিয়া দেয়।—কিন্তু ঘরছাড়া যেই করুক, কর্ম্মকার মহাশয় উপস্থিত কাহাকেও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাই আমাদের এলোমেলো মনগুলোকে গুছাইয়া লইয়া কাজে লাগাইবার জন্য তিনি একখানা হিসাবের খাতা খুলিয়া বসিলেন,—চরকা-সম্মেলনের হিসাব। সুতরাং মেঘ, ময়ূর, মাঠ,—সকলই বিদায় লইল। আর কাজ-হারানো এমন সন্ধ্যাটা সত্যই শেষে কাজের মধ্যে হারাইয়া গেল।

হিসাব কিছুক্ষণ ধরিয়া চলিল। অনেক টাকার ব্যাপার নয়, তবু অর্থসংগ্রহে একটা বিশেষত্ব দেখা গেল। সম্মেলনের ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য চাঁদা তোলা হইয়াছে। দুই চারিজনে বেশী করিয়া দিয়া যে সহজে কাজ মিটাইয়াছেন, তাহা নয়। কাছাকাছি কুড়ি বাইশ খানা গ্রাম হইতে বহু গৃহস্থ কিছু কিছু দিয়াছেন,—দু'পয়সা, চার পয়সা, দুই আনা,—যাঁর যেমন সাধ্য। বহুলোকের দান কুড়াইয়া কাজ তোলা হইয়াছে বলিয়া এই কার্য্যে বহুলোকের সহানুভূতির যোগও রহিয়াছে।

কথাবার্ত্তা চলিতেছে। সম্মেলনের যাঁরা উদ্যোগী তাঁদের একজন বলিলেন, "আমি ত পণ ক'রেছি, আমাদের ঘরের সকলের কাপড় নিজের হাতের সুতোয় তৈরী করে দেবো।"

ইনি উৎসাহী কর্ম্মী,—পঁচিশ মাইল দূরেও যদি কংগ্রেসের কোন সভায় যাইতে হয়, ইনি অকাতরে পদব্রজে সেখানে গিয়া হাজির হন। তাই ইঁহার মুখে পণের এই কথাটা যে বাজে

কথা নয়, তাহা সহজেই বুঝিলাম। তবু বলিলাম, "পণরক্ষাটা ঠিকমত হবে ত?"

কর্ম্মী দৃঢ়ভাবে উত্তর করিলেন, "হয়েছে কিনা, সময়ে তখন জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবেন।"

বিনা দ্বিধায় এমন সোজা জবাব বড় পাওয়া যায় না,—খাদি-কার্য্যসম্বন্ধে ত নয়ই। তাই উৎসাহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু এত যে সূতো কাটবেন, তুলো ত সহর থেকেই কিনে আনতে হবে।"

"কেন বুড়ী কাপাসের গাছ সব লাগিয়েছি, এরই মধ্যে কত তুলো আমার সংগ্রহ হ'য়ে গেছে।"

তুলা পেজা, ধোনা প্রভৃতি সূতাকাটার আগের ব্যাপার সবই এই কর্ম্মীর পূরা দখলে আছে। তা ছাড়া, যত্ন করিলে এঁদের এই অঞ্চলে তুলা জন্মায়। সুতরাং এমনি করিয়া নিজের জমিতে প্রয়োজনমত তুলা উৎপন্ন করিয়া লইতে পারিলে ত একরূপ বিনা মূল্যেই কাপড় পাওয়া যায়। তাই কর্ম্মীর সেই পণের কথা শুনিয়া এই কথাই বার বার মনে হইতে লাগিল যে এঁদের চেষ্টা যদি এই পথে সফল হয়, তবে 'স্বাবলম্বী খাদির' পথ বহু গ্রামেই খুলিয়া যাইতে পারিবে।

হিসাব-নিকাশের পর খুসীমত গল্প সুরু হইল। কংগ্রেস, চরকা, খদ্দর, ইউনিয়ন বোর্ড, টিউব-ওয়েল, মামলা-সালিশী, হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা,—কিছুই বাদ গেল না। আবার রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, অরবিন্দ, লেনিন, হিটলার, এঁরা সব কথাবার্ত্তার মধ্যে দিব্য

অবাধে আনাগোনা করিতে লাগিলেন,—আর চাঁদের আলোয় বাহিরটা ক্রমে খুব জমকালো হইয়া উঠিল। তারপর একটু অধিক রাত্রে যখন আহারের ডাক পড়িল, তখন বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখি পাঁচ রকমের এতগুলি লক্ষ্মীছাড়া অতিথির ভিড়ে গৃহস্থের আনন্দ আর ধরে না।

সকাল সকাল উঠিয়া মাঠের পথ ধরিলাম। সঙ্গীর চেহারাটি বেশ লম্বাচওড়া, তার উপর 'যাত্রা' করিবার সখ আছে। এমন আমুদে মানুষকে দেখিয়া চাষীরা কাস্তে ফেলিয়া মুখ তুলিয়া তাঁর করতালের খোঁজ লইতে লাগিল। কিন্তু গাওনা কোথায় ছিল,—এই সুমিষ্ট প্রশ্নের সদুত্তর মিলিল না, কারণ সঙ্গী তখন চরকা-সম্মেলনের হিসাব-নিকাশের হাওয়া হইতে মুক্ত হইয়া আসিতেছেন,—যাত্রার আসর উপস্থিত কোথাও জমে নাই।

পলাশপাই গ্রামে * * * মহাশয়ের বাড়ীতে উঠিলাম। কি সমাদর! সন্ধ্যার পর এক পাঠশালার অঙ্গনে গ্রামের অনেকে আসিয়া একত্র হইলেন। বৈঠক জমিল। চরকা সম্বন্ধে অনেকে উৎসাহ দেখাইলেন। তাঁহাদের এই চেতনাটুকু দেখিয়া মনে হইল, সুকৌশল ও সুতীব্র চেষ্টা দ্বারা এই অঞ্চলে গ্রামের বহু পরিবারকে বস্ত্রে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা সম্ভব।

পরদিন সকালবেলা নতিবপুরে আসিলাম। বড়ডোঙ্গল গ্রামের বন্ধুদের বাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া পথযাত্রায় যখন যে দিকে গিয়াছি, সর্ব্বত্রই আতিথ্যের সরলতায় মুগ্ধ হইয়াছি। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। নতিবপুর গ্রাম মনীষী

ভূদেববাবুর জন্মস্থান। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজীয়ানার সর্ব্বব্যাপী প্রভাবের মধ্যে আমাদের পরাধীন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন একান্ত আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেছিল, তখন স্বদেশী সমাজ এবং তাহার সাধনা ও সংস্কৃতির কথা নূতন করিয়া বুঝাইয়া দেশে যাঁহারা নবচেতনা-সঞ্চারের সূত্রপাত করেন, ভূদেব তাঁহাদের অগ্রণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গত শতাব্দীর বাঙলায় যে সকল দিক্‌পাল জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ভূদেবের মত পল্লীমায়ের সন্তান। সেকালে পল্লীর খড়ে-ছাওয়া চণ্ডীমণ্ডপে মাদুরে বসিয়া বেদান্তচর্চ্চা হইত, আর একালে বৈঠকখানা ঘরে আসবাবপত্রের ভিড়ের মধ্যে ধ্যানী-বুদ্ধমূর্ত্তি সখের 'পেপার ওয়েট' হইয়া আছেন। সেকাল ফিরিবে না। পল্লীর মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে,—শিল্প বিলুপ্ত, কৃষি অবনত, অসংখ্য নদীনালা নিশ্চিহ্ন, আর ম্যালেরিয়া সর্ব্বব্যাপী। গ্রামে গ্রামে শিল্পশোভার সার মন্দিরসমূহ ভগ্ন, বিগ্রহশূন্য, আর মানুষ নিরন্ন, অবসন্ন। "মহতী বিনষ্টিঃ", যেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেকাল ফিরিবে না জানি,—কিন্তু একালের দাবী মিটাইতে মানুষ যে দিনে দিনে দেউলিয়া হইয়া উঠিল। নূতন কালের সাধনা আজ কে করিবে?

রাত্রি একটা আন্দাজ বিদায় লইলাম। মাঠের উপর দিয়া ক্রমে নদীর ধারে আসিয়া খুব ছোট একটি ডিঙ্গীতে উঠিয়া বসিলাম। ডিঙ্গী ছাড়িয়া দিল। চাঁদ তখন ডুবিয়া গিয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, অন্ধকার। আকাশের এক কোণে মেঘ জমিয়া

বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। নদীর দুই পাড় খুব উঁচু। অপ্রশস্ত নদীগর্ভে অন্ধকার তাই জমাট বাঁধিয়াছে। ডিঙ্গীতে বসিয়া এলোমেলো চিন্তাধারা শেষে এক জায়গায় আসিয়া ঠেকিল,—সে যেন মহাতীর্থ। ভাবিলাম,—আমাদের গরীবের দেশ এই ভারতবর্ষে দুঃখের রাতে আশার আলো কে জ্বালিল, কাহার অমোঘ তপঃশক্তি কল্যাণের পথে দেশে কর্ম্মের আহ্বান আনিল, কাহার সাধনা দেশকে সিদ্ধির পথ দেখাইল, কাহার দুর্নিবার তেজ দেশকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দিল?—কেন দেশ গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিল? কেন? কেন? গান্ধীজী বহুশক্তির আধার, বহুকর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তবু শক্তি নয়, কর্ম্ম নয়,—দেশ সাড়া দিয়াছে তাঁর প্রেমে,—যে প্রেম গভীর অতলস্পর্শ, যার স্বরূপ-নির্দ্দেশ করা যায় না,—"ইয়ত্তয়া বা ইদৃক্তয়া বা"। সেই প্রেমের আহ্বানে জাগিয়া উঠিয়া কোটি কণ্ঠে দেশ গাহিয়াছে,—"হে মোর দরদিয়া, হে মোর দরদিয়া"।

স্বাধীনতার উপাসক আজ কয়জন, যাঁরা সত্যভাবে আত্ম-নিবেদন করিতে পারিয়াছেন? তথাপি ভারতবর্ষের সুবিশাল ক্ষেত্রে যে মুষ্টিমেয় কর্ম্মিগণ ছড়াইয়া আছেন, আজ অন্ধকারের বুকের মধ্যে তাঁদের হৃৎস্পন্দন শুনিতে পাইতেছি। সেই স্পন্দনের তালে তালে ভারতবর্ষের এই বিরাট দেহ বহু বিরোধ, বিক্ষেপ ও বিচ্ছেদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রাণবান্ হইয়া উঠিতেছে। তাই গভীর নিশীথে অন্ধকার নদীবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে আমি সেই স্বাধীনতার সাধকগণের নিকট সম্ভ্রমে মাথা নত করিতেছি।

বহু ব্যর্থতার মধ্যে হয়ত তাঁদের জীবনক্ষয় হইয়া যাইবে। তবু একথা নিশ্চিত যে তাঁদের গৌরবময় ব্যর্থতার অসামান্য শক্তিতেই দেশে সফলতার নূতন মাপকাঠি গড়িয়া উঠিবে। রাত্রির স্তব্ধ ঘন অন্ধকারে এই সব "অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ" সেবকের নিঃস্বতার ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করিয়া আজ তাঁদের পথযাত্রার সঙ্গীত শুনিতে পাইতেছি,—

"অযাত্রাতে নৌকা ভাসা
রাখিস্ নে ভাই ফলের আশা
আমাদের আর নাই যে গতি
ভেসেই চলা বই।"

———

হিন্দুস্থান উথল যায়েগা

"সারা হিন্দুস্থান উথল যায়েগা" কথাটার সঙ্গে কত গৌরবময় স্মৃতিই না জড়িত রয়েছে! আজ মনে পড়ে গান্ধীজীর ডাণ্ডী-অভিযানের কথা। সত্য ও অহিংসার অস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেনাপতি যাত্রা সুরু ক'রেছেন। সারা হিন্দুস্থান মুগ্ধনেত্রে, আশাপূর্ণহৃদয়ে, সেই সত্যসন্ধ মহামানবের দিকে চেয়ে আছে। পূর্ণিমার রাতে মুক্ত আকাশে চাঁদ যখন হাসে, তখন সমুদ্রের বিশাল বুক কেমন উদ্বেল হ'য়ে ওঠে, কেমন উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতে তার হৃদয়-দোলা দুলতে থাকে, কি বিপুল, গভীর অন্দোলনে, কি অসীম, উন্মত্ত চঞ্চলতায় অধীর পারাবার পূর্ণচন্দ্রের সেই সৌম্য, শান্ত, অলক্ষ্য অথচ দুর্ব্বার আকর্ষণে উথলে ওঠে! তেমনি উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল, তেমনি একটা মহা অন্দোলনে দুলে উঠেছিল সারা হিন্দুস্থান গান্ধীজীর সেই পুণ্য-প্রয়াণের দিনে। জাতির ইতিহাসে সে কি মহাতিথি, বিষাদ-মলিন পরাধীন ভারতের ভাগ্যে সে কি পুণ্য পূর্ণিমা, কি অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের উদয়! কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত, শান্ত, সৌম্য কর্ম্মযোগীর সেই মহা আহ্বানে কি অলক্ষ্য অথচ দুর্ব্বার আকর্ষণই না ছিল! বিশাল ভারত তাঁর ডাক শুনে সাড়া দিয়েছিল, আসমুদ্রহিমাচল তাঁর পথযাত্রার তালে তালে একই প্রাণের দোলায় দুলে উঠেছিল।

ঐক্যের এই সাধনা খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতের অন্তস্তলে যুগ যুগ ধ'রেই চলে এসেছে। এই ঐক্য আমরা অন্তরে উপলব্ধি ক'রে থাকি, কিন্তু ঠিকমত তার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে পারি না। কত বিভেদ, বুদ্ধিভেদ, কত মতভেদ, ভাষাভেদ, ধর্ম্মভেদ আমাদের আড়াল ক'রে দাঁড়ায়,—ঐক্যের পূর্ণমূর্ত্তি অবলুপ্ত হ'য়ে যায়। তবু মনে প্রাণে এই পরম সত্য আমরা অনুভব করি যে বহু বৈচিত্রের মধ্যেও ভারতবর্ষ এক ও অখণ্ড। গান্ধীজীর সেই পথযাত্রার কালে ভারতের এই অখণ্ড রূপই মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষ আপনার অখণ্ডত্ব এমন পরিপূর্ণরূপে আর কখনও বুঝি উপলব্ধি করতে পারে নি। প্রাচীন ভারতের যুগযুগবাহী তপস্যা এবং নবীন ভারতের কর্ম্মসাধনা সেদিন যেন গান্ধীজীর যাত্রাপথে পরস্পরের হাত ধ'রে দাঁড়িয়েছিল। গান্ধীজীর সে পথযাত্রা ভারতবর্ষেরই জয়যাত্রা,—এই ঐতিহাসিক সত্য আজ নিজের মহিমায় দীপ্যমান্। "সারা হিন্দুস্থান উথল যায়েগা" এই মহাবাণী ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে,—জাতি গর্ব্বভরে চিরকাল সে কথা স্মরণ করবে।

পদ্মাতীরে

[১৯৪০ ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজী পদ্মাতীরে মালিকান্দা গ্রামে আসিয়াছিলেন।

কিসের এই সাড়া, কেন এ প্রাণকম্প, অযুত হৃদয়ে কে আনন্দের দোলা দিল, প্রেমের স্পর্শ দিয়ে কে দুঃখের রাত্রে প্রভাতের আলোর ছটা ছড়াইয়া দিল? কে সে? গান্ধীজী, গান্ধীজী! তাই পদ্মাতীরে আজ লক্ষ লোকের সমাগম, তাই মালিকান্দা গ্রামের প্রান্তভাগে একদিকে শ্যাম বেণুবনবেষ্টিত ও অপরদিকে কলনাদিনী পদ্মাশোভিত বিস্তৃত প্রান্তরে এই জনসমুদ্র দরদীর অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় গান্ধীজী? সকলেই দর্শন চায়। মানুষ এমন দর্শনপাগলও হয়? পিপীলিকাশ্রেণীবৎ লোক আসিতেছে,—নরনারী, বালকবৃদ্ধ, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-হরিজন কেহ বাকী নাই। দূর দূরান্ত হইতে তাহারা আসিয়াছে, কেহ পদব্রজে, কেহ বা নৌকাযোগে। পদ্মাতীরে আজ তাহারা হিন্দুস্থানের প্রাণের আলো গান্ধীজীকে শুধু একবার দেখিয়া যাইবে। এই যে দেখা,—যিনি মহৎ, যিনি লোকোত্তর, যিনি শুদ্ধসঙ্কল্প, পথ যাঁর ঋজু, কর্ম্ম যাঁর নিষ্কাম, বীর্য্য যাঁর অমোঘ, প্রেম যাঁর অতলস্পর্শ সেই মহাত্মার দর্শন লাভ করিতে মানুষের এই যে আগ্রহ, তার পশ্চাতে

আছে একটা দেশব্যাপী জাগৃতি। গান্ধীজী হৃদয় দিয়ে হিন্দুস্থানের হৃদয় জয় করিয়াছেন। আজ ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারী যদি "একটিমাত্র শিশু" হইত, তবে গান্ধীজী মাতার স্নেহে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতেন এবং সত্য ও প্রেমের দীক্ষায় পুষ্ট করিয়া, অহিংসার বর্ম্মে ও সত্যাগ্রহের অস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া তাহাকে কর্ম্মের পথে সঙ্কটযাত্রায় পাঠাইয়া দিতেন। গান্ধীজীর প্রেম ব্যবধান মানে না, দেশকালের বাধা সেই প্রেমকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। তাই সেই প্রেমের দুর্জ্জয় শক্তিতে হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভূতির ভূমিকম্প লাগে, আর মানুষ ছুটিয়া ছুটিয়া আসে। তাই পদ্মাতীরে আজ জনারণ্য।

ইহারা সব পল্লীগ্রামের জনসাধারণ,—দারিদ্র্যে কাতর, রোগে জর্জ্জর, শিক্ষার অভাবে মূক এবং স্বাধীনতা-হীনতায় আশাহীন। কিন্তু ইহারা দ্রুত জাগিয়া উঠিতেছে,—গান্ধীজীর নিকট ইহারা স্বরাজের বাণী শুনিতে চায়। গান্ধীজী ইহাদের হৃদয় বুঝেন। যুগ যুগবাহিত এবং পরম্পরাগত যে চিন্তাধারার মধ্যে এদের মন ধর্ম্মের, জ্ঞানের এবং মনুষ্যত্বের সন্ধান করিয়া ফিরে, যার বিধিবিধানে এদের গৃহস্থালী প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন এবং সায়াহ্ন হইতে প্রাতঃ পর্য্যন্ত সুখে দুঃখে, হাসিকান্নায় আলোছায়ার জাল বুনিয়া দিনের পর দিন নিজ পথে চলিয়া যায়, গান্ধীজীর মধ্যে ইহারা যে প্রকারেই হউক জাতির সেই মর্ম্মকথার সন্ধান পাইয়াছে। তাই তাঁহাকে দেখিতে এবং তাঁহার কথা শুনিতে জনগণের এই বিপুল ও দুর্ব্বার আগ্রহ। দেশব্যাপী অভাব,—

অন্ন নাই, প্রাণ নাই, শিক্ষা নাই, সর্ব্বগ্রাসী দৈন্যে মনুষ্যত্ব অবনত, নিষ্পেষিত ; তবু হতশ্রী দশার এই কঠিন স্তর ভেদ করিয়া ইহাদের মধ্যে পৌঁছিতে পারিলে বুঝা যায় যে ইহারা খুব বড় একটা সভ্যতার উত্তরাধিকারী, মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনার বহু পথ ইহাদের মনের কাছে মুক্ত হইয়া আছে। তাই গান্ধীজী

"But the moment you talk to them and they begin to speak, you will find that wisdom drops from their lips. Behind the crude exterior you will find a deep reservoir of spirituality. I call this culture. In the case of the Indian villager an age-old culture is hidden under an encrustment of crudeness. Take away the encrustation, remove his chronic poverty and his illiteracy and you have the finest specimen of what a cultured, cultivated, free citizen should be" :—'Harijan.'

শিক্ষার অভিমানে স্ফীত হইয়া আমরা অনাদরে এদের দূরে পরিহার করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ভালবাসিয়া যদি কাছে যাই, আপন বলিয়া যদি কথা কই, তা'হলে সাড়া ইহারা দেয়, কথা ইহারা কয় ; আর সেই সরল ভঙ্গীর সরল কথায় আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি যে এদের মনের স্বাভাবিক গতি

কল্যাণের পথে। ইহারা গ্রামের লোক, চাকচিক্যের ধার ধারে না। কিন্তু গ্রাম্যতার কঠিন আবরণের তলে ইহাদের মনোরাজ্যে কল্যাণসাধনের ধারা নিত্য প্রবাহিত আছে। ইহাদের শিক্ষা দাও, বহুকালের কঠোর দারিদ্র্য ঘুচাও, তাহা হইলেই দেখিবে সেই শ্রীহীন আবরণ ভেদ করিয়া সুসভ্য, মার্জ্জিত ও শীলসম্পন্ন স্বাধীন পৌরজন প্রকাশ পাইতেছে।

দেশবাসীর আত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে এই সত্যের বোধ গান্ধীজীর নিকট পুঁথিগত বা বুদ্ধিগত নহে, একেবারে হৃদয়গত ও মর্ম্মগত। তাই গান্ধীর টানে তাহাদের মর্ম্মে টান ধরে, তাহারা বুঝিতে পারে,—"তোমার মত এমন টানে কেউ ত টানে না।" গান্ধীজী ইহাদের অন্তরের সত্য পরিচয় জানেন বলিয়াই মাদক-দ্রব্য-বর্জ্জনের উপযোগিতা-বিচারের সময় দৃঢ়ভাবে বলিতে পারেন যে দেশবাসীর **moral momentum** অর্থাৎ সদ্ধর্ম্ম ও সুনীতি সম্পর্কে ইহাদের মনের গতি ও মজ্জাগত বিশ্বাস ঐরূপ বর্জ্জনের সম্পূর্ণ অনুকূল। বহু শিক্ষার ফলে মার্কিন দেশবাসীর মনের গঠন আজও মাদক-বর্জ্জনের অনুকূলে গঠিত হইতে পারিল না. কিন্তু বহুযুগব্যাপী শিক্ষার অভাবের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ একটা সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের বলেই ভারতবাসীর মন মাদক-বর্জ্জন ব্যাপারটাকে সহজে গ্রহণ করিল। ভারতীয় কৃষ্টির উৎকর্ষ এই খানেই, শ্রেয়ের প্রতি এই স্বাভাবিক আকর্ষণে। মহাত্মাজী অহিংসা ও সত্যের শক্তি অবলম্বন করিয়া ভারতীয় মনের এই ক্ষেত্রের উপরই সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে চাহেন। তিনি বিপ্লব চান,

কিন্তু সত্যাগ্রহ তাঁহার অস্ত্র। এই অস্ত্র-চালনার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে সেবাবুদ্ধি-সঞ্জাত রচনাত্মক কার্য্যের মধ্য দিয়া। ভারতভূমির সর্ব্বত্রই আজ প্রাণের স্পন্দন, ভারতবর্ষ নূতনের স্বপ্নে ভরপূর হইয়াছে। পদ্মাতীরে লক্ষ নরনারীর মধ্যে তারই একটা বিশিষ্ট প্রকাশ দেখা গেল। তাই রচনাত্মক কাজে যাঁহারা বিশ্বাসবান্ আজ নূতন করিয়া তাঁহাদের গুরু দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। এই যে দেশব্যাপী চাঞ্চল্য, উত্তেজনা ও প্রাণকম্প লক্ষিত হইতেছে, সহস্র সহস্র কেন্দ্রে গঠনমূলক কাজের প্রতিষ্ঠা দ্বারা ইহাকে সংযমের ও শাসনের মধ্যে আনিয়া বিপুল শক্তিতে পরিণত করিতে হইবে। শব্দকে সুকৌশলে সংযত করিলে স্বর হয়, বাষ্পকে সুকৌশলে সংযত করিলে হয় অপূর্ব্ব গতিবেগ-বিশিষ্ট শক্তি; তেমনি স্বরাজ-লাভের জন্য জনগণের এই হৃদয়চাঞ্চল্যকে গঠনমূলক কাজের মধ্যে সুকৌশলে সংযত ও চালিত করিতে পারিলেই দুর্জ্জয় বৈপ্লবিক শক্তি উদ্ভূত হইবে,—যাহার দুর্ব্বার আঘাতে সাম্রাজ্যবাদ ও পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

পদ্মাতীরে গান্ধীজী যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা যেমন সরল তেমনি সংক্ষিপ্ত। আজ বিশ বৎসর ধরিয়া গান্ধীজী কাজ করিয়াছেন ও কাজ চাহিয়াছেন, কথা যা বলিয়াছেন তা শুধু কাজেরই জন্য। তাই লক্ষ লোকের সমাবেশ হইলেও গান্ধীজী গঠনমূলক কাজের সেই পুরাতন বাণীই তাহাদের শুনাইয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি মোটামুটি এই—"আজ চার পাঁচদিন ধ'রে হাজার

হাজার ভাইবোন আমাকে দেখতে এসেছেন, তাই মনে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। আমাকে অভিনন্দনপত্র অনেকে দিয়েছেন, সে সকল পড়তে আমার সময় নেই। আমি তা গ্রহণ করেছি আর সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। বাঙলা দেশ থেকে আমাকে টাকার থলি উপহার দেওয়া হয়েছে। সে টাকা বাঙলারই হবে,—বাঙলার কাজের জন্য থাকবে। ১৯২১ সালে নাগপুর কংগ্রেসে চারটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল,—সেই চারিটি প্রস্তাব স্বরাজের চার স্তম্ভের মত। প্রস্তাবগুলি হচ্ছে,—খদ্দর ও চরকা, হিন্দু-মুসলমানের একতা, অস্পৃশ্যতা-নিবারণ এবং মাদক-দ্রব্য-বর্জ্জন। কংগ্রেসের কাছে ঐ চারিটি কার্য্যপ্রণালী এখনও স্থির আছে। উহাকে ঠিকমত কার্য্যে পরিণত করতে পারলেই স্বরাজ লাভ হবে। ১৯২১ সাল থেকে কংগ্রেসের এই কার্য্যক্রম চলে আসছে, আজ ঐগুলির প্রতি শ্রদ্ধা একটুও কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে। উপস্থিত স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে হরিজনও আছেন। সকলেই উপরোক্ত কার্য্যক্রমের জন্য চেষ্টা করবেন। ঐ চারিটির মধ্যে সকলে যা করতে পারেন সে হচ্ছে চরকা। দুঃখের কথা, এত বৎসরেও চরকার কাজ যা হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। সভায় যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই খদ্দর পরেছেন। নিজের সূতা নিজে কাটলে খদ্দরের দাম কম হবে। আর এইটুকু পরিশ্রম যদি আপনারা করেন, তবে আমাকে আর নালিস করতে হবে না। আমরা বেশ উপলব্ধি করেছি যে প্রত্যেকে কমপক্ষে আধ ঘণ্টা এবং বেশীপক্ষে এক ঘণ্টা চরকা

কাটলে নিজের কাপড় তৈরী ক'রে নিতে পারেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যদি আপনারা দৈনিক একঘণ্টা ব্যয় করতে না পারেন, তবে স্বাধীনতায় আপনাদের অধিকার কি? ইউরোপে লোকে অনেক কষ্টে স্বাধীনতা রক্ষা করে,—কোটি কোটি টাকা তাঁদের ব্যয় হয় এবং বহুলোকের জীবন বলি পড়ে। তার তুলনায় চরকা-চালানো কতটুকু ব্যাপার? চরকার কথাই আমি বলে আসছি এবং আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার মুখে আপনারা অন্য কথা পাবেন না। ১৯২০ সালে যা বলেছি, আপনারা তাই করুন, তা হ'লেই স্বরাজ লাভ হবে। বহিনদের একটা কথা বলি। স্বাধীনতা-অর্জ্জনের চেষ্টায় পৃথিবীতে কোথাও মেয়েরা পুরুষদের মত ভাগ নেয় নি। কিন্তু অহিংসার ভিত্তির উপর স্বরাজ-লাভের চেষ্টায় মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অধিকতর স্থান নিতে পারেন, কারণ সেই চেষ্টায় চরকাই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন, আর চরকার কাজে মেয়েরাই অধিকতর পটু। অনাদিকাল থেকে তাঁরা চরকা কেটে এসেছেন। খাদি-সংস্থাগুলি জানে, এখনও পুরুষদের চেয়ে মেয়ে কাটুনীই বেশী। হিন্দু-মুসলমান ও অন্য সকলে চরকা গ্রহণ ক'রে পরস্পরের সহযোগিতা করতে পারেন। চরকার ভিত্তিতে স্বরাজ হ'লে সেই ব্যাপারে মেয়েরা নিশ্চয়ই পুরুষের চেয়ে বেশী স্থান নিতে পারবেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য মেয়েদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে ভারতীয় নারীগণকে চরকার আদর্শে অনুপ্রাণিত করুন।"

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"

মালিকান্দায় কয়েকজন কর্ম্মী গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট বাঙলা কংগ্রেসের বর্ত্তমান জটিল অবস্থার কথা উল্লেখ করেন এবং নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন। উত্তরে গান্ধীজী যে কথাগুলি বলেন, বাঙলার বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহা বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। কংগ্রেস-সমস্যার আলোচনা করিতে গিয়া তিনি উপনিষদের সেই মহাবাণীর উল্লেখ করেন,—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে। বাস্তবিক কংগ্রেসকে সত্যভাবে পাইতে হইলে, তাহার আনন্দ সত্যভাবে ভোগ করিতে হইলে, অবস্থা-বিশেষে তাহাকে ছাড়িতে হইবে,—দূরে থাকিয়াই তাহার সেবা করিতে হইবে। পাওয়ার সঙ্গে ছাড়ার এই নিগূঢ় সম্পর্ক আমরা ভুলিয়া যাই বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বহু জটিলতা ও আবিলতার সৃষ্টি হয়, আর আমরা তাহার আবর্ত্তে ঘুরপাক খাইয়া দিশাহারা হইয়া পড়ি।

বহু কর্ম্মীর ত্যাগ, সাধনা ও কর্ম্মচেষ্টা দ্বারা আজ কংগ্রেসের মধ্য দিয়া দেশে একটা শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। যাঁহারা ত্যাগের দ্বারা দেশের সেবা করেন নাই, আজ অবসর পাইয়া বহুস্থলে তাঁহারা প্রভু হইয়া কংগ্রেসের এই প্রভাবটুকু আত্মসাৎ করিতে

চান। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, "True source of right is duty"—সকল অধিকারের মূলে আছে কর্ত্তব্য-সাধন, সকল পাওয়ার আগে আছে ছাড়া, সকল ভোগের আদিতে আছে ত্যাগ,—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"। এই সত্য ভুলিলেই স্বার্থের নেশা পাইয়া বসে, আর স্বার্থ আনে ভেদ এবং ভেদের মধ্য দিয়া দুর্ব্বলতা আত্মপ্রকাশ করে। তখন কর্ম্মের পথে কাঁটা পড়িয়া দলাদলিই সার হইয়া দাঁড়ায়। আবার যাঁহাদের ত্যাগের উপর কংগ্রেস গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদিগকেও বিশেষ করিয়া আজ মনে রাখিতে হইবে,—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"। তাহা হইলে কংগ্রেসী কলহের অবসানের পথ পাওয়া যাইবে। সকল সময়েই বহু কর্ম্মীর পরস্পরের সহযোগিতায় কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হয়। আর মানুষ ত দোষেগুণে। কাজেই পরস্পরের দুর্ব্বলতা সহ্য করিয়া চলিতে হইলে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আপোষ করিয়া চলিতেই হয়। কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। গান্ধীজী বলেন, কর্ম্মক্ষেত্রে অপ্রধান ব্যাপারে আপোষ করিতে প্রস্তুত থাকা উচিত হইলেও মূলনীতি লইয়া কখনও আপোষ করা চলে না। সে অবস্থায় তফাৎ যাইলেই কল্যাণ হয়। কংগ্রেসের অফিস ও পদ আঁকড়াইয়া থাকিবার জন্য যদি সত্যকে চাপা দিয়া, মিথ্যা সভ্য দ্বারা কংগ্রেসের খাতা ভর্ত্তি করিতে হয়, তবে সে কলঙ্কের দায় এড়াইয়া কংগ্রেস ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তখন আর কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহ করিবার প্রশ্ন থাকে না। যাহা থাকে তাহা জন-সেবা। কর্ম্মীর সুমুখে, পিছনে, দক্ষিণে বামে

সর্ব্বত্র দুঃস্থ নরনারী। সেবার ক্ষেত্র সর্ব্বত্রই উন্মুক্ত। কর্ম্মী তখন নীরবে, সুচিন্তিত সেবাকার্য্যে বুদ্ধিপূর্ব্বক লাগিয়া যাইবেন। মনে রাখিবেন, প্রকৃত দেশ-সেবকই দেশের স্বাধীনতা আনিবে। মিথ্যা সভ্য যাঁহারা, অস্তিত্বই যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দেওয়া যদি কখনও সম্ভব হয়, তবে কাগজের নৌকায় বিশাল পদ্মানদী পার হওয়াও একদিন সম্ভব হইতে পারিবে।

কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া গৌণ ব্যাপারে যাঁহাদের আপোষ করিয়া চলিতে হইবে, তাঁহারা কোথায় আপোষ করিবেন এবং কোথায় করিবেন না, এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী কয়েকটি কথা বলেন। তিনি বলেন, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহা নিরাগ্রহবুদ্ধিতে অবস্থাবিশেষের তথ্য-সংগ্রহের উপর নির্ভর করে। ইহার জন্য বাঁধাধরা নিয়ম করিয়া দেওয়া চলে না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিলে কাজ হয়। কর্ম্মী যখন বুঝিবেন যে আপোষ করিয়াও কর্ম্মক্ষেত্রে চলিবার পথে হৃদয়ের প্রসার বাড়িতেছে ('feeling of expansion') তখন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। কিন্তু যখন বুঝিবেন যে আপোষের ফলে হৃদয় সঙ্কুচিত ('feeling of contraction') ও গ্লানিযুক্ত হইতেছে, তখন জানিবেন মূলে কোথাও আঘাত পড়িতেছে। তখন অচিরাৎ আপোষের ক্ষেত্র ছাড়িয়া দেশসেবার অন্য ক্ষেত্রে প্রস্থান করিবেন। মনে রাখিবেন,—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ", মনে রাখিবেন পাওয়ার সঙ্গে ছাড়ার নিগূঢ় সংযোগ। ছাড়ার মধ্যে

এই যে পাওয়া,—ইহাই নিষ্কামতার পথ। কর্ম্মযোগী এই পথে বিচরণ করেন।

গান্ধীবাদ

গান্ধীবাদ কি? প্রশ্নটি যত অস্পষ্ট, ইহার উত্তরও তত কঠিন। যাঁরা বলেন, গান্ধীবাদ ধ্বংস হোক, তাঁরা গান্ধীবাদ বলিতে কি বুঝেন আমরা তাহা বুঝি না, অনেকেই হয়ত বুঝেন না। গান্ধীবাদ যদি পড়িয়া মার খাওয়া অথবা কাপুরুষতার নামান্তর হয়, তবে তাহা অচিরে ধ্বংস হওয়া ভাল,—গান্ধীজী তাই চান, প্রত্যেক বিচারশীল ব্যক্তিও তাই চান। গান্ধীবাদ অর্থে যদি মাত্র চরকা-চালানো হয়, অর্থাৎ দেশ ও সমাজে আর যা কিছু যেমন আছে তেমনি থাক, অথবা যে পথে যায় সেই পথে যাক,—কেবল গান্ধী মহাত্মা ব্যক্তি, অতএব তাঁর খাতিরে চরকায় সূতা কাট, তিনি খুসী হইবেন,—আর তার ফলে দেশটা স্বাধীন যদি হয় ত হইবে,—গান্ধীবাদে যদি এই বুঝায়, তবে তা ধ্বংস হোক, গান্ধীজী তাই চান, গান্ধীকে যাঁহারা বুঝেন তাঁহারাও তাই চান। গান্ধীবাদ বলিতে যদি গরীবের শোষণ-কার্য্যে সহায়তা বুঝায়, আর শোষণ যাহারা করে তাহাদের

করুণাভিক্ষা বা তাহাদের সঙ্গে কোনও মতে আপোষ-রফা বুঝায়, তবে সে গান্ধীবাদ ধ্বংস হোক্,—আমরা তা চাহি না, গান্ধীজী তা চান না।

কিন্তু গান্ধীবাদ কি তাই ? "বাদ" বলিলে অনেক সময়ে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট, সুস্পষ্ট, সীমাবদ্ধ মত বুঝায়,—যাহারা সেই "বাদের" বাদী তাহাদের পক্ষে তাহার বাহিরে যাওয়া চলে না। গান্ধীবাদ এরূপ কোন "বাদ" নহে। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী বলেন গান্ধীবাদ কথাটাই উঠিয়া যাওয়া ভাল, কারণ গান্ধীবাদ বলিয়া স্বতন্ত্র একটা মতবাদ কিছু নাই। অহিংসা ও সত্যের শাশ্বত ভিত্তির উপর গান্ধীজী মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক গঠিত করিতে চান। কিন্তু দেশব্যাপী কর্ম্মচেষ্টা ব্যতীত এই পুনর্গঠন কখনও সম্ভবপর হয় না। সুতরাং বুঝিতে হয়, গান্ধীবাদ বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে সেটা নিতান্তই একটা কাজের ব্যাপার, আর সত্য ও অহিংসার আলোয় সর্ব্বদা সেই কাজের পথ ও কৌশল খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, সত্য ও অহিংসার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতেই সেই পথের পাথেয় সংগ্রহ করিতে হয়। সুতরাং এই কাজের পথের যিনি পথিক, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী দিন দিন অভিনব হইয়া উঠে। এই কাজের ক্ষেত্র সমস্ত দেশ জুড়িয়া আছে। ইহার মধ্যে দেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন সর্ব্বাগ্রেই আসে। কারণ দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, শিক্ষাহীনতা, মনের পরাজয়, দেহের পরাজয়,—সকল রকম দুঃখের মূলেই আছে পরাধীনতা। তাই গান্ধীবাদ কতকগুলি মতের সমষ্টিমাত্র নয়, ইহা একটা

চলমান জীবন্ত ব্যাপার, সত্য ও অহিংসার লক্ষণাক্রান্ত একটা বিরাট সুকৌশল কর্ম্মচেষ্টা, যাহার দ্বারা, দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়া মানুষের সহিত মানুষের সত্য সম্পর্ক আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

গান্ধীবাদ কাপুরুষের অহিংসা বা পড়িয়া মার খাওয়া নহে। গান্ধীর স্পর্শে ভারতের জনগণ জাগিয়াছে, তাহাদের ভয় ভাঙ্গিয়াছে। অহিংসা আঘাত করে না, কেবল আঘাত গ্রহণ করে এবং তাহা সর্ব্বদাই বীরের মত,—যেমন পেশোয়ারের পাঠানগণ আঘাত না করিয়া বন্দুকের সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছিল, যেমন সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সহস্র সহস্র কেন্দ্রে অসংখ্য লোক,—নরনারী, বালক বৃদ্ধ যুবা,—প্রতিঘাত না করিয়া নীরবে বহু নির্য্যাতন ও প্রহার সহ্য করিয়াছিল, তথাপি নির্ভয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই। দেশ যে জাগিয়াছে, ভয় যে ভাঙ্গিয়াছে, তাহা বীরত্বেরই স্পর্শে, মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার জাগরণে,—ভয়কুণ্ঠিত কাপুরুষের দ্বিধায় কখনও নহে। দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট এই সত্যে যিনি সন্দিহান, আশা করি তিনিও একদিন ইহা স্বীকার করিবেন।

গান্ধীবাদে চরকা নিশ্চিতরূপেই আছে কেন্দ্রে,—মর্য্যাদাস্থলে। সাত লক্ষ বুভুক্ষু গ্রামে ভারতবর্ষের শোষণ-পীড়িত জীবন আজ কোনও মতে বাঁচিয়া আছে। চরকা তাহার বস্ত্রের সংস্থান করিবে, চরকা তাহাকে কাজ দিবে, তাহার আলস্য ঘুচাইবে, সাত লক্ষ দীন পল্লীতে চরকাকে কেন্দ্রে রাখিয়া লুপ্তপ্রায় পল্লীশিল্প

পুনর্জীবন পাইবে,—পল্লীর ম্লানমুখে আবার হাসি ফুটিবে। চরকা দিয়া দেশ-কর্ম্মী ভারতের জনগণের মনের রাস্তা খুঁজিয়া পাইবে, অসংখ্য কেন্দ্রে দেশকে আবার কর্ম্মমুখর করিয়া তুলিবে। চরকা অর্থে দেশব্যাপী বিশাল একটা কার্য্যক্রম বুঝায় যাহাকে অবলম্বন করিয়া দেশ আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইবে।' চরকা দেশ-সেবার শক্তি দিবে, অহিংসার পথে নূতন আলোকপাত করিবে। চরকা অহিংসার প্রতীক, কারণ চরকা-প্রচেষ্টায় শোষণ কোথাও নাই,—আর এই শোষণই হইল হিংসার গোড়ার কথা,—সভ্যতার মুখোস পরিয়া শোষণের শতপথেই হিংসা রাক্ষসীর আনাগোনা। শোষণের উদ্দেশ্যেই ব্যবসা-বাণিজ্য, শোষণের জন্যই সাম্রাজ্য বিস্তার এবং তারই অনিবার্য্য পরিণতি হইল পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ। মানুষের বুদ্ধি ও চেষ্টা আজ সর্ব্বত্র গৃধ্নুতা কলঙ্কিত। আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব-কোলাহলের মধ্যে চরকাই সরল, সুস্থ ও নির্লোভ জীবনের পথ নির্দ্দেশ করে। ইহা না বুঝিয়া যাঁহারা কলের পুতুলের মত সুধু চরকা ঘুরাইয়া গান্ধীর নামে সস্তায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন, তাঁহারা কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই। ভগবানে মন না রাখিয়া শুধু মালাজপ করা যেমন একান্ত নিষ্ফল, গণ-কল্যাণ সম্পর্কে চরকার অফুরন্ত সম্ভাবনাকে ক্রমশঃ মুক্ত করিতে না পারিলে, শুধু তার চক্রের আবর্ত্তন তেমনই নিষ্ফল। উভয়ই আত্মপ্রবঞ্চনা।

কর্ম্মক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ পৃথিবীতে একটা অভিনব ব্যাপার। চলতি উপায়ে কর্ম্মসিদ্ধির যেমন একটা পথ ও পদ্ধতি

আছে, অহিংস উপায়ে কৰ্ম্মসাধনের তেমনি একটা স্বতন্ত্র ও অভিনব পথ ও পদ্ধতি আছে, একথা বুদ্ধিপূর্ব্বক স্বীকার করিলে তথাকথিত গান্ধীবাদ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারের নিরসন হইতে পারে।

অহিংস বিপ্লবের অন্তিম ফল "ভূমি ত সব গোপালকী",—সেখানে শোষণের স্থান নাই। অহিংসার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত সেই সমাজে প্রত্যেক মানুষ তার জীবিকার জন্য পরিশ্রম করিবে,—শ্রম হইবে যজ্ঞ। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার নীতি সেই পরিকল্পনায় কখনও স্থান পাইবে না। কিন্তু তৎপূর্ব্বে অহিংসার অভিনব পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেশের পরাধীন দশা ঘুচাইতেই হইবে।

অহিংস নীতিতে আপোষের স্থান আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কোন্ নীতিতে নাই? লেনিন সম্বন্ধে একটা অতি প্রশংসাসূচক কথা এই যে,—"Lenin was a genius at compromise." সময় বুঝিয়া আন্দোলনের বা সংগ্রামের গতির মুখে প্রয়োজনমত আপোষ ত করিতেই হয়। মূল খোয়াইয়া আপোষ করা আহাম্মকী বটে, কিন্তু আপোষ মাত্রেই তাহা নয়। সংগ্রাম চালাইবার দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া, যাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে আপোষহীন সংগ্রামের রব তুলিয়া আকাশ ফাটাইতে থাকেন, তাঁদের চীৎকারে আকাশের সঙ্গে তাঁদের গলা ফাটিতে পারে, কিন্তু শত্রুব্যূহের কোথাও একটিও ফাট ধরিবে না। অভিজ্ঞ নেতা যদি জানিয়া বুঝিয়াও দেশের যুবকদের ভ্রান্ত পথে চালাইবার নেশা ছাড়িতে

না পারেন, চিন্তার স্থানে চীৎকার, উৎসাহের স্থানে উত্তেজনা, কর্ম্মের পরিবর্ত্তে মাতামাতি, শক্তির পরিবর্ত্তে ঔদ্ধত্য, তেজ ছাড়িয়া দম্ভ এবং নিয়ম ছাড়িয়া অনিয়মই যদি তাহাদের সম্বল হইয়া দাঁড়ায়, তবে তার অতি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া সামলাইতে একদিন প্রাণান্ত হইবে।

গান্ধীবাদ বলিয়া প্রকৃতই একটা মতবাদ নাই। তথাপি গান্ধীবাদ বলিতে যদি কাপুরুষতা হয়, গান্ধীবাদ বলিতে যদি চরকার নিস্ফল আবর্ত্তন বুঝায়, গান্ধীবাদ বলিতে যদি ধনী দ্বারা গরীবের শোষণকার্য্যে সহায়তা বুঝায়, গান্ধীবাদ বলিতে যদি বিদেশীর দরবারে দেশের প্রকৃত স্বার্থ অর্থাৎ কল্যাণকে জলাঞ্জলি দেওয়া বুঝায়, তবে সে গান্ধীবাদে জলাঞ্জলি দেওয়াই ভাল, সে গান্ধীবাদ ধ্বংস হোক। কিন্তু গান্ধীবাদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু,—দেশের গত বিশ বৎসরের ইতিহাস তার সাক্ষী।

গান্ধীবাদ প্রেম ও অহিংসার ভিত্তির উপর পৃথিবীতে নূতন সভ্যতার পত্তন করিতে চায়। ইহা দুর্দ্দশাগ্রস্ত, রণক্লান্ত ও হিংসাপীড়িত মানুষের নূতন স্বপ্ন। বহু সাধকের শিক্ষা ও সাধনার বলে ভারতভূমিতে মানুষের মনের উপর অহিংসার প্রভাব স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়া আছে। কিন্তু সে অহিংসা নিষ্ক্রিয়,—তাহা দুর্ব্বলের। তাহাকে সক্রিয় করিয়া তুলিয়া বলবানের অস্ত্ররূপে জীবন-সংগ্রামে প্রয়োগ করিতে হইবে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাহার সাধন চলিবে,—ইহাই হইল গান্ধীজীর জীবনের স্বপ্ন। ভারতক্ষেত্রে যদি এই স্বপ্নকে সফলতার দিকে লইয়া

যাইতে পারা যায়, তবে মানব-সভ্যতা-বিকাশের নূতন পথ খুলিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

"হরিজন"

(১৯৪০, নভেম্বর মাসে গান্ধিজী "হরিজন" বন্ধ করিয়া দেন)

"হরিজন" বন্ধ হইয়া গেল। "হরিজনে" গান্ধীজী অহিংসার বাণী প্রচার করিতেছিলেন। এ বাণী শুধু ভাবসাধকের নহে, কর্ম্মযোগীর মর্ম্মকথা ইহার মধ্যে নিয়ত ঝঙ্কৃত হইয়াছে, ভারতবর্ষের ঐক্য ও স্বাধীনতার জয়গানে ইহা মুখরিত। "হরিজনে" আমরা নিষ্ক্রিয় অহিংসার কথা কখনও দেখি নাই, আমরা দেখিয়াছি তাহার কর্ম্মময় রূপ, সত্যাগ্রহের মধ্যে তাহার যোদ্ধৃবেশ। অহিংসা মানবধর্ম্মের সার। ভারতীয় সংস্কৃতির মূলগত উপাদান হইল অহিংসা। মহাভারতে মানবজীবনের বহু বৈচিত্র্য, বহু ঘটনা ও বহু সমস্যার মধ্যে, মানুষের লোভ, দ্বেষ, লালসা ও অহঙ্কারের বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, মানুষের অভিজ্ঞতার ক্রমবিস্তারের মধ্যে আমরা দেখি অহিংসার আলো ফুটিয়া উঠিতেছে, পূর্ণ জীবনকে ধারণ করিবার জন্য পূর্ণ অহিংসার উপযোগিতার কথা বুঝান হইয়াছে। বোধিসত্ত্বগণ, স্বয়ং বুদ্ধদেব এবং জৈন

ধর্ম্মাচার্য্যগণ অহিংসাকে মানুষের পরম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যুগে যুগে যাঁহারা ভারতীয় চিন্তা ও সাধনার ধারা বহন করিয়া আসিয়াছেন, দুর্দ্দিনের ঘনান্ধকারে জাতির জীবন-পথে যাঁহারা আলোকের সন্ধান দিয়াছেন, সেই শ্রমণ সন্ন্যাসী-সাধু-ফকিরগণ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ ও পালন করিয়া আপনারা ভাগবত জীবন লাভের অধিকারী হইয়াছেন এবং অপরকে সেই মহাজীবনের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় জীবনের স্তরে স্তরে এই অহিংসার ধারা বহমান। ভারতীয় মনে অহিংসার প্রতি যত শ্রদ্ধা তত আর কোথাও নহে। অহিংসার ভিত্তির উপর স্বীয় রাজ-ধর্ম্মকে স্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই পৃথিবীর রাজন্যবৃন্দের মধ্যে মহারাজ অশোক এক এবং অদ্বিতীয়। জাতির জীবনের এই অতি সুপ্রাচীন এবং অবিচ্ছিন্ন মূলধারার সহিত যুক্ত করিয়া দেখিলে ভারতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে গান্ধীজীর উদয় আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিবার হেতু থাকিবে না।

মধ্যযুগে একদিকে জয়দৃপ্ত মুসলমান ও অপরদিকে হিন্দুগণের বিরোধের ফলে এক সময়ে মানুষের জীবন গ্লানিকর হইয়াছিল এবং সত্যধর্ম্ম অন্ধতার পঙ্কে নামিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় মনের উপর এই বিরোধের যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, তাহা বড় আশ্চর্য্য। ভারতীয় প্রতিভা বহুর মধ্যে একের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সমন্বয়ের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটাইয়া শান্তি আনিয়াছে। এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। বিরোধের প্রতিক্রিয়ারূপে উভয়

সম্প্রদায়ের মধ্যে কবীর, দাদু, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি সাধু মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়া করুণা ও প্রেমের উৎস খুলিয়া গিয়াছিল। সেই প্রেমধারা বিরোধের তীক্ষ্ণতা শান্ত করিয়া উভয়ের ধর্ম্মের মধ্যে সত্যের যে শাশ্বত রূপ রহিয়াছে, তাহাই উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহারই স্পর্শে হিন্দু-মুসলমান জনগণের মনে ক্রমে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি, বিশ্বাস ও সহানুভূতি জাগিয়া সমাজ-জীবনে শান্তি আসিয়াছিল।

বহুর মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে, ভেদের মধ্যে, বিরোধের মধ্যে ভারতীয় সাধনা এই প্রেম ও অহিংসার ভিত্তির উপর ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের জটিল জীবনযাত্রায়, প্রাণান্তকর স্বার্থসংঘাতের মধ্যে গান্ধীজী ভারতীয় সাধনার উত্তরাধিকার সেই প্রেম ও অহিংসার বাণী লইয়া জাতীয় জীবনের সকল সমস্যার মীমাংসার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। নির্জ্জন গুহায় বসিয়া তিনি সত্য ও অহিংসার সাধনা করেন নাই। লোকালয়ের মধ্যে দিনের পর দিন, বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন সমস্যায়, বহুবিধ জটিল পরিস্থিতির মধ্যে, সর্ব্বপ্রকার লোক-ব্যবহারে সত্য ও অহিংসার তিনি যে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন, তাহারই বিচিত্র কথা আমরা "হরিজনে" পাঠ করিয়াছি। চলতি জগতের গতি যে পথে সেথায় মানুষের লোভ, দ্বেষ, হিংসা ও অহঙ্কারের তাড়নাই সমধিক। সাম্রাজ্যবিস্তার, পরদেশ-শোষণ প্রভৃতি অতিকায় ব্যাপারে কূট বুদ্ধি ও কৌশলের যে খেলা, যন্ত্র ও যুদ্ধের যে পৈশাচিক লীলা আমরা তাহারই

সহিত পরিচিত। তাহার উৎকট ও বিচিত্র প্রকাশ দেখিয়া আমরা কখন বিস্মিত, মুগ্ধ, স্তম্ভিত, কখনও বা ভীত, চকিত, ত্রস্ত। তাহার গতিপথকে শক্তিমানের একমাত্র পথ জানিয়া আমাদের চিন্তাধারা তাহারই সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু গান্ধীজী আপন সাধনা দ্বারা মানুষের জীবনযাত্রার নূতন পথ কাটিয়া তৈরী করিতেছেন।

সত্য, প্রেম, অহিংসা কিছু নূতন কথা নহে। কিন্তু জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বদাই তাহার প্রয়োগ চলিতে পারে এবং সেই প্রয়োগের পদ্ধতি কল্যাণময় বলিয়া তাহার দ্বারা মানুষের জীবন-যাত্রা কল্যাণমুখী হইয়া উঠে,—বর্ত্তমান জগতে এই সকল নূতন কথা ত বটে। মানুষের সহিত মানুষের ব্যবহারে, জাতির সহিত জাতির সম্পর্কে, মানব-জীবনের সর্ব্বপ্রকার সমস্যায়, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ে সত্য, প্রেম ও অহিংসার প্রয়োগ দ্বারা মানুষ স্বচ্ছন্দে জীবনপথে অগ্রসর হইয়া, সর্ব্বত্র কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে,—এই সকল নূতন কথা একান্তভাবেই "হরিজনের" নিজ কথা। অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে গণ্ডীমুক্ত করিয়া এই নূতন পথে ফিরাইতে পারিলে মানবজীবনের বহু নূতন সম্ভাবনার কথা বুঝিতে পারা যায়। সেই সকল কথা "হরিজনে" পাওয়া যাইত। গান্ধীজীর অনেক কথা অনেক সময়ে হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইত। কিন্তু আপাততঃ যাহা হেঁয়ালী,—কার্য্যতঃ তাহাই অপূর্ব্ব কর্ম্মকৌশল বলিয়া স্বীকৃত হইতেও বেশী বিলম্ব ঘটিত না। এই নূতন পথযাত্রার গতিভঙ্গী নূতন, তার

কর্ম্মকৌশল, রীতি, পদ্ধতি সকলই অভ্যস্ত পথ হইতে স্বতন্ত্র। তাই চলতি মাপকাঠিতে সেই পথের হিসাব হওয়া কখনও সম্ভব হয় না। গান্ধীজী বলিয়াছেন,—হিংসা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে জীবন সেখানে মানুষ আপন অধিকারের স্বল্পমাত্রও ছাড়িতে চায় না, পাছে অধিক হারাইতে হয়, অন্যথা নির্ব্বুদ্ধিতার ফলভোগ তাহাকে করিতেই হয়। কিন্তু অহিংসার পথ ভিন্ন। অহিংসার সুরে যে জীবন বাঁধা, সেখানে অল্প চাহিলে মানুষ অনেক দিতে পারে,—তার গতিই ঐ। অনেক ছাড়িয়াই সেই পথে মূল বস্তুটিকে রক্ষা করিবার শক্তি উপচিত হয়। তাই "হরিজন" সম্পর্কে গান্ধীজীর নিকট গবর্ণমেণ্ট যাহা দাবী করিয়াছে, পাইয়াছে তাহার অনেক বেশী। "হরিজন" বন্ধ করিয়া দিয়া গান্ধীজী সত্যাগ্রহীর প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

"হরিজনের" চিন্তা, বিষয়, ব্যাখ্যান সকলই ছিল অভিনব,—সেই হিসাবে "হরিজন" ছিল এক এবং অদ্বিতীয়, পৃথিবীর অন্য সকল পত্রিকা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রণোন্মাদে মত্ত হইয়া মানুষ যখন মানুষের রক্ত পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও আবার পান করিতে চায়, মানব-সভ্যতার সেই সঙ্কটকালে সত্য, প্রেম ও অহিংসার সাধক গান্ধীজীর গভীরতম চিন্তার কথা হইতে পৃথিবী আপাততঃ বঞ্চিত হইল।

খাদির কথা

আজকাল খাদির নিন্দা একটা ফ্যাসন্ হইতেছে। আগে যাঁহারা খাদি পরিয়া বাহাদুরী করিতেন, এখন তাঁহারা খাদি ছাড়িয়া বাহাদুর হইয়াছেন। স্বাধীন চিন্তায় অগ্রণী বলিয়া বাঙালীর একটা অভিমান আছে। কিন্তু মনে রাখা ভাল যে স্বাধীন চিন্তার ছদ্মবেশে চিন্তারাজ্যে যদি অরাজকতা জাঁকিয়া বসে, তবে অকল্যাণ বৃদ্ধি পায়। তাহাতে লোকসানই হয়।

অনেকে মনে করেন খাদি গান্ধীর খেয়াল এবং পরের ফরমাইস —সুতরাং ঘাড়ে লওয়া যায় না। কেহ বলেন, খাদি একটা মূর্ত্ত কুসংস্কার, বৈজ্ঞানিক বিচারে টেঁকে না। মহাযন্ত্রের সাহায্যে এখন মহাশিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই হইল বিজ্ঞানের বাণী। বিজ্ঞানের রথেই আজ শিল্পের জয়যাত্রা হইবে। অতএব চরকার ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়িয়া দাও। এই ধরণের চিন্তায় যাঁরা অগ্রসর, তাঁরা আজকাল খাদির আবেদনকে নিজেদের কেতাবী বিদ্যার ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দেন। তাঁরা সাফ্ বলেন এ যুগে ঐ সব চলিবে না। কিন্তু কি যে চলিবে তাহাও তাঁরা বলেন না। বলুন, আর নাই বলুন, যাহা চলিবার তাহাই চলিতেছে,—সেটা হইল লক্ষপতি বা ক্রোড়পতির পরিচালিত মিলের কাপড়। যাঁহারা দেশকে ভালবাসেন অথচ খদ্দরকে ভালবাসেন না, সসম্মানে ও সবিনয়ে তাঁদের কাছে বলা যাইতে পারে যে খদ্দরকে দূরে ঠেলিয়া

তাঁরা দেশের গরীবদেরই দূরে ঠেলিতেছেন। অথচ দেশের গরীবকে দূরে ঠেলা এবং দেশকে ভালবাসা এই দুইটার মধ্যে বিরোধ আছেই।

পরাধীন অবস্থায় জাতীয় যন্ত্রশিল্প-গঠনের স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক,—অনেকে তা দেখেনও। কিন্তু সাম্যবাদীর সকল সময়েই একটা অতি ন্যায্য গর্ব্ব এই যে তিনি বাস্তব লইয়া কারবার করেন,—স্বপ্ন লইয়া নয়। বাস্তববাদীকে আজ এই সত্যটা স্বীকার করিতেই হয় যে স্বাধীন রাষ্ট্রের শক্তির পোষকতা ব্যতীত যন্ত্র-শিল্প কোথাও গড়িয়া উঠে নাই। ইংল্যাণ্ড বা ইটালী, জার্ম্মাণী বা রাশিয়া, সকল দেশে রাষ্ট্রের সাহায্যেই যন্ত্র-শিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে,—তা সে রাষ্ট্র ধনিক-রাষ্ট্রই হোক, আর শ্রমিক-রাষ্ট্রই হোক। ভারতে যন্ত্রশিল্প অত্যল্পমাত্র অগ্রসর হইয়াছে, তাহাও আবার বৈদেশিক শাসনচক্রের তলে পিষ্ট হইয়া যাইবার ভয়ে সদাই শঙ্কিত। আর এই অনগ্রসর যন্ত্রশিল্প এদেশে ধনীকেই আরও ধনী করিতেছে,—গরীবের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে। গরীব নিজ কুটীরে বসিয়া যে শিল্পকর্ম্মটুকু করিতে পারিত, সে কাজ আর তাহার নাই। সকল রকমের শিল্পীরই আজ এক দশা—সবাই বেকার। এই কঠিন বাস্তবকে উপেক্ষা করা চলে না। দেশ স্বাধীন হউক, যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠুক,—এ সব বেশ ভাল কথা। কিন্তু যতদিন সেই আদর্শ যন্ত্রশিল্প আদর্শ স্বাধীন রাষ্ট্রের আশ্রয়ে গঠিত না হয়, ততদিন বেকার গরীবগুলা মরিতে থাকুক এটা বেশ ভাল কথা নয়। আজ খাদিই সেই দুঃসহ

দুঃখ-লাঘবের প্রধান উপায়। খাদি নিরন্নের অন্ন, বন্যা ও দুর্ভিক্ষে সহায়। খাদিপ্রচেষ্টা দেশকর্ম্মী ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে সহযোগের স্বর্ণসেতু। খাদি গণসংযোগ আনিয়াছে, গণচেতনা জাগাইয়াছে। স্বপ্নবিলাসী একথা হয়ত ভুলিতে পারেন, কিন্তু সাম্যবাদী বা বাস্তববাদী কর্ম্মীর একথা ভুলিলে চলিবে কেন?

সাম্যবাদীর দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক। নিজের বুদ্ধির আভিজাত্য ও যুক্তির উৎকর্ষ বাঁচাইয়া চলা তাঁহার অভ্যাস। খাদিগ্রহণে অতিমাত্রায় অগ্রগামী রাজনীতিকেরও বুদ্ধি এবং যুক্তি একটুমাত্র খর্ব্ব হইবার কথা নয়, বরং হৃদয়ে গর্ব্ব অনুভব করিবারই কথা,—কেননা, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অর্থাৎ বাস্তব পরিস্থিতিতে নিঃসম্বল গরীবের স্বার্থের সহিত একমাত্র খাদিরই মিল আছে। তা ছাড়া খাদিপ্রচেষ্টা অর্থশাস্ত্রসম্মত। সাম্যবাদী চান উৎপাদনের হেতুভূত অর্থবল ও যন্ত্রবল জাতীয় সম্পত্তি হউক,—তাহা হইলে একের দ্বারা অন্যের শোষণ বন্ধ হইবে। খাদি-সম্পর্কে ঠিক তাহাই হইয়াছে। কারণ খাদি-উৎপাদনের জন্য যে মূলধন খাটে তা ধনী-বিশেষের অর্থ নয়,—কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে তাহা জাতীয় সম্পত্তি। আবার খাদি-উৎপাদনের যন্ত্র যে চরকা ও তাঁত—তাহাও দেশের গরীবদের ঘরে ঘরে ছড়াইয়া আছে, ধনী-বিশেষের আয়ত্তের মধ্যে নয়। খাদি অগণিত অসহায়কে কাজ দিয়া জাতির কর্ম্মপঙ্গুত্ব ঘুচায় এবং খাদি-উৎপাদনে দেশে প্রকৃত ধন উৎপন্ন হয়। খাদি প্রচেষ্টায় ধনী বা দালাল গরীবকে শোষণ করিবার কোনও সুযোগ পায় না। দেশের বর্ত্তমান বাস্তব

অবস্থায় খাদির উপযোগিতা বৈজ্ঞানিক এবং সাম্যবাদসম্মত। খাদির ব্যবহারে খাঁটি গণতান্ত্রিক আত্মায় একটুও গ্লানিস্পর্শ হইবে না।

নিখিল ভারত চরকা-সঙ্ঘের কার্য্যবিবরণী হইতে দেখা যায় গত বৎসরের খাদির প্রচার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭ সনে ১০২৮০ খানি গ্রামে খাদির কার্য্য হইয়াছিল,—১৯৩৮ সনে ১৩০০০ গ্রামে ঐ কার্য্য বিস্তৃত হইয়াছে। ১৯৩৬ সনে ৭২ লক্ষ টাকা মূল্যের খাদি উৎপাদনের স্থলে ১৯৩৮ সনে ১ ক্রোর ২৩ লক্ষ টাকার খাদি উৎপন্ন হইয়াছে। এই হিসাবে বৃদ্ধির হার শতকরা ৭১। নিখিল ভারত চরকা-সঙ্ঘ-ভুক্ত কাটুনীদিগের সংখ্যা ১৯৩৭ সনে ছিল ১ লক্ষ ৭৭ হাজার, সেইস্থলে ১৯৩৮ সনে হইয়াছে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার। তাঁতীদিগের সংখ্যা ১৯৩৭ সনে ১৩ হাজার হইতে ১৯৩৮ সনে ১৮ হাজারে পৌঁছিয়াছে। ১৯৩৭ সনে মজুরী বাবদ কাটুনী পাইয়াছিল ১০ লক্ষ টাকা এবং তাঁতীরা ৭ লক্ষ টাকা; সেইস্থলে ১৯৩৮ সনে কাটুনী ও তন্তুবায়গণ যথাক্রমে ২১ লক্ষ টাকা ও ১৩ লক্ষ টাকা পাইয়াছে।

খাদি-উৎপাদনের নূতন ব্যবস্থায় মজুরীর হার-বৃদ্ধি ভালরূপ হইয়াছে। বর্ত্তমানে ৮ ঘণ্টা ভাল করিয়া চরকা কাটিলে দুই হইতে তিন আনা উপার্জ্জন করা যাইবে। সমপরিমাণ তুলা ধুনিয়া এখন এক আনার স্থলে দুই আনা মজুরী মিলিবে। এই ব্যবস্থায় মজুরীর হারবৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ৫০।

খাদি দেশের হাজার হাজার গরীব লোককে অন্ন দিতেছে।

নিখিল ভারত চরকা-সঙ্ঘের সুব্যবস্থায় খাদির ব্যবসায়ে অর্থাৎ খাদির উৎপাদন হইতে বিক্রয় পর্য্যন্ত খাদিসংক্রান্ত সর্ব্বব্যাপারে প্রত্যেকটি পয়সা গরীবের ঘরে যায়। ইহাতে শোষণ নাই—গরীবের মাথায় কেহ কাঁঠাল ভাঙ্গে না। অতএব সোস্যালিষ্ট, কমিউনিষ্ট, বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, পুঁথিপন্থী,—সকল রকমের দেশপ্রেমিক খাদি ব্যবহার করুন।

খাদি-উৎসব

গান্ধী-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের কাল এক সপ্তাহ। এই সপ্তাহকে স্বয়ং গান্ধীজী খাদি-সপ্তাহ নাম দিয়াছেন। তিনি চাহেন, তাঁহার জন্মদিন লইয়া দেশে যে উৎসব তাহা হউক খাদি-উৎসব। কিন্তু খাদি লইয়া কি উৎসব জমিবে? হাতে-কাটা সুতায় হাতে-বোনা কাপড়,—তার আবার উৎসব কিসের? গান্ধীকে লইয়া যে উৎসব তাহা বুঝা যায়। কারণ গান্ধীর জগৎ-জোড়া নাম, পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগাইয়াছেন, দেশের এত বড় নেতা তিনি! তাঁহার জন্মদিনে উৎসব ত ভাল রকমই জমে, স্বাধীনতার দাবী জানাইয়া জোর বক্তৃতা দিবার উপলক্ষ্য মিলে, অহিংসার জয়গান গলা ছাড়িয়া করা যায়, যন্ত্র-সভ্যতার

দোষগুলি উদ্ঘাটন করিয়া লোকের চোখের সুমুখে বেশ ধরা চলে,—এমন আরও কত কি করা যায়—যেমন সভা, গান, শোভা-যাত্রা, ধ্বজা, পতাকা ইত্যাদি। কিন্তু যাঁর জন্মদিন লইয়া উৎসব, তাঁর কাছে এই সকল একবারে না-মঞ্জুর, যদি-না উৎসবের কেন্দ্রে এবং মূলে থাকে খাদি, যদি-না উৎসবের সুর জমে চরকার গুঞ্জনে। কি চরকা-পাগল মানুষ।

কিন্তু পাগল কি আর সাধে? পাগল না হইলে গান্ধীর স্বরাজ মিলিবে কি করিয়া? মানুষের প্রেমে গান্ধী পাগল, নিপীড়িত মানবকে তিনি মুক্তির সত্য পথের সন্ধান দিতে চান, হিংসা ও শোষণের পথ বন্ধ করিয়া সাধু শ্রমের উপর নূতন সমাজ গড়িতে চান, দুরন্ত লোভের বশে মানুষের হাতে মানুষের যে চরম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা ঘুচাইবার জন্য চল্‌তি পথের উল্টা পথেই তিনি চলিতে চান,—তাই তিনি চরকা-পাগল।

গান্ধীজী আদর্শবাদী, কাজের মধ্যে তিনি আপন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে চান। কাজ ধরিয়া তিনি মাটিতে হাঁটেন,—কল্পনার দোলায় চড়িয়া আকাশ-কুসুম রচনা করিবার অভ্যাস তাঁহার নাই। মানুষ লইয়া, মানুষের সমাজ লইয়া, তাহার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা লইয়া তাঁহার কারবার। মানুষের সকল চেষ্টা সকল ক্ষেত্রে যাহাতে কল্যাণের পথে যায়, মানুষের শুভবুদ্ধি সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া যাহাতে প্রকৃত মানবতার বিকাশ হয়, তাহার জন্য গান্ধীজী-সমাজ ব্যবস্থাকে একেবারে ঢালিয়া সাজিতে চান। তাঁর এই কল্যাণময় কর্ম্মসাধনের উপায় হইল চরকা।

কিন্তু চরকা কেন? চরকা কি একটা বিজ্ঞানসম্মত উপায়? বিজ্ঞানসম্মত কি না তার বিচার না করিয়া আগে বুঝিতে হইবে চরকার ব্যাপার ন্যায়সঙ্গত বটে। চরকাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের শ্রমকে ন্যায়ের ভিত্তির উপর ফলপ্রসূ করিয়া তোলা যায়। শ্রম যদি শোষণহীন ও ন্যায়ানুগত হয়, তবে সমাজে ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ খুলিয়া যায়। এইরূপে ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কের উপর সত্য ও প্রেমের আলোক-পাত হইতে থাকে, এবং মানুষ একে অপরের প্রতিযোগী ও শত্রু না হইয়া সহযোগী ও মিত্র হইবার পথ দেখিতে পায়। তখন মানুষের ব্যক্তিত্ব চাপা না পড়িয়া ক্রমেই বিকশিত হইয়া উঠে, এবং সমাজে সত্যভাবে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে আদিম কালের চরকা দ্বারা এই কাজ কি সত্যই সম্ভব হইবে?

গান্ধীজী বলেন,—হাঁ হইবে। বিজ্ঞান বলিয়া ধাঁধা লাগিবার কিছু নাই। বিজ্ঞানের বলে উড়ো জাহাজ হইতে হাজার হাজার বোমা ফেলিয়া নিয়ত মানুষ মারা হইতেছে,—আদিম কালের অসভ্য মানুষ গণ-হত্যার এমন পরিপাটী ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। তাই মানুষকে এখন বিজ্ঞান হইতে ন্যায়ের দিকে সত্য-ভাবে মুখ ফিরাইতে হইবে। নহিলে মানুষের রক্ষা নাই। আর বিজ্ঞানই বা কি? সে ত মানুষের সৃষ্টি। স্বার্থের পথে মানুষের অন্তর আজ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে সত্যের আসন নাই। ভোগের নেশায় মাতিয়া মানুষ হাঁকিতেছে,—আরও

চাই, আরও আরও,—আর বিজ্ঞানকে সে জুড়িয়া দিয়াছে ভোগের উপকরণ-সংগ্রহের কাজে। বিজ্ঞান করিবে কি? সে ত জড়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, বিজ্ঞানসম্মত পন্থা, এই সব বুলির দ্বারা মানুষ আত্মপ্রতারণা করিয়া চলিয়াছে। ভুল করিয়া তার ফল-ভোগ করিতেছি, লোভ করিয়া পাপে মজিয়াছি, পাপের ফলে মৃত্যুর পরোয়ানা আসিয়াছে,—সোজা কথা সোজাভাবে না দেখিয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সাহায্যে যদি বলি মানুষের এই অবস্থা ঐতিহাসিক কারণ-পরম্পরার অনিবার্য্য পরিণতি, ইহাতে মানুষের হাত নাই, মানুষের দায় নাই, তাহা হইলে ত চুকিয়া যায়,—চুপ করিয়া নিজের মরণ নিজে দেখা এবং সম্ভব হইলে উপভোগ করা ছাড়া তখন আর গতি থাকে না। কিন্তু মানুষ ত শুধু দ্রষ্টা নয়, সে স্রষ্টাও বটে। বস্তুজগতে নিয়ত ঘটনা ঘটিতেছে। মানুষ তাহা দেখিতেছে, দেখিয়া দেখিয়া তথ্য হইতে সে তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে। বিদ্যুৎ দেখিয়া, বিদ্যুতের তত্ত্ব বুঝিয়া লইয়া, মানুষ বিদ্যুতকে আপন কাজে লাগাইতেছে অর্থাৎ দ্রষ্টা হইতে সে ক্রমে স্রষ্টা হইতেছে। এই সৃষ্টি-ক্ষমতাই ত মানুষের বিশেষত্ব। গান্ধীজী মানুষের এই সৃষ্টি-ক্ষমতাকে সত্যভাবে সমাজ-গঠনের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টায় চরকা হইল তাঁহার প্রধান উপায়।

সামাজিক ঘটনা-পরম্পরার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে শুধু বিজ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা মানুষ বাঁচিবে না, তাহার ন্যায়দৃষ্টি খুলিয়া দিতে হইবে। ন্যায়ের স্থান বিজ্ঞানের

উপর হইলে, স্রষ্টা মানুষ দ্রষ্টা মানুষের উপর উঠিলে, ত্যাগী মানুষ ভোগী মানুষকে সংযত করিতে পারিলে, আজ মানব সভ্যতা এমন করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিত না। পৃথিবীতে আজ জাতিতে জাতিতে হত্যা ও লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতা চলিতেছে, অথচ আশ্চর্য্য এই যে পৈশাচিক কার্য্য-সমর্থনের জন্য মানুষ আজও ন্যায়ের দোহাই দিতে ছাড়ে না। গান্ধীজী মানুষের এই সহজাত এবং স্বাভাবিক ন্যায়বুদ্ধিকে জাগাইয়া রাখিয়া কল্যাণ-কর্ম্মের মধ্যে তাহাকে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করিতে চান। কারণ মানুষের ন্যায়-বুদ্ধি মাঝে মাঝে জাগিলেও লোভ ও মোহের বশে তাহা আবার ঘুমাইয়া পড়ে,—পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ছাড়াইয়া উঠিবার মত জোর তাহার নিয়ত থাকে না। গান্ধীজী মানুষকে এমন কাজ দিতে চান, এবং সেই কাজের দ্বারা এমন সামাজিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে চান, যাহাতে মানুষের লোভ ও লুণ্ঠনবৃত্তি সংযত হইয়া তাহার প্রেম ও ন্যায়বুদ্ধি জাগে, তাহার ভিতরের পশুটা ঠিকমত শাসন ও সংযমের মধ্যে থাকিয়া উপরের মানুষ সাড়া দেয়। গান্ধীজী জানেন চরকা দ্বারা এই কাজ সম্ভব। চরকা এবং চরকাকে কেন্দ্রে রাখিয়া শোষণহীন পল্লীশিল্প মানুষের জন্য এই ন্যায়ের আশ্রিত সামাজিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে। তাই মানব-প্রেমিক গান্ধীজী চরকা-পাগল।

গান্ধীজী কর্ম্মযোগী। কর্ম্ম তাঁহার যজ্ঞ। যজ্ঞ অর্থে ত্যাগের দ্বারা কল্যাণের প্রতিষ্ঠা। এই কল্যাণ-কর্ম্ম সত্য, অহিংসার পথেই সম্ভব। লোভ ও লুণ্ঠনের পথে চলিয়া মানুষ

সর্ব্বনাশের কিনারে আসিয়া পৌছিয়াছে। গান্ধীজী তাহাকে সত্যের পথে ফিরিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন এবং কর্ম্মকে যজ্ঞ হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে চরকা লইতে বলিতে-ছেন। গান্ধীজী বিপ্লবী। সমাজ-গঠন নূতন করিয়া করিতে হইলে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করা চাই, নহিলে গঠনকার্য্য চলে না। কর্ম্মযোগী গান্ধী তাই সত্যাগ্রহের অস্ত্র লইয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু তিনি জানেন, কল্যাণময় লক্ষ্য-সাধনের পথও কল্যাণময় হওয়া চাই। অন্যায়ের দ্বারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হয় না। তাই তাঁর উপায়গুলিও সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণময়।

অহিংসার পথেই গান্ধীজী নবসমাজ গঠন করিতে চান। নূতন ভিত্তির উপর তার অর্থনীতিও যে নূতন রূপ লইবে ইহা ত স্বাভাবিক। হিংসার মূলকথা হইল শোষণ। শোষণহীন কর্ম্মব্যবস্থা অহিংসার উপরই দাঁড়াইতে পারে। স্বয়ং-পূর্ণ পল্লী-শিল্প এই কর্ম্মব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। বড় বড় কারখানায় ইহা সম্ভব হইবে না। উৎপাদনের উপায় যেমন হইবে, সমাজব্যবস্থাও তদনুরূপ দাঁড়াইবে। বড় বড় কারখানাঘরের আশে পাশে সহরের উৎপত্তি,—সেখানে শিল্প কেন্দ্রীভূত, মানুষের ব্যক্তিত্ব পিষ্ট এবং অস্বীকৃত, মাথার উপরের অল্প কয়েকজন লোকের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা ন্যস্ত,—সহর ভাঙ্গিলেই জাতির জীবন-কেন্দ্র ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু বি-কেন্দ্র শিল্প ঘরে ঘরে চলিবে,—ইহা গ্রামে গ্রামেই সম্ভব। ইহাতে ব্যক্তি কাজ করিয়া সৃষ্টির

আনন্দ পাইবে, তাহার ব্যক্তিত্ব পিষ্ট ও অস্বীকৃত হইবে না। সহস্র সহস্র গ্রামে জাতির জীবন-কেন্দ্র সৃষ্ট হইবে,—ইহাতে জাতি হইবে বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত। জাতির এই বহু সহস্র জীবনকেন্দ্র এবং শক্তিকেন্দ্র সহজে ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। এই শোষণহীন বি-কেন্দ্র শিল্পের উপর ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজ গঠিত হইয়া উঠিবে। চরকা হইল ইহার প্রতীক। তাই অহিংস উপায়ে স্বরাজলাভের জন্য গান্ধীজী চরকা অবলম্বন করিতে বলেন। চরকা আমাদের মনকে গ্রামমুখী করিবে, আমাদের গ্রামের মধ্যে বসাইবে, গ্রামের জীবনধারার সঙ্গে আমাদের সত্যকার যোগসাধন করিবে, কর্ম্মিগণকে একই কর্ম্মসূত্রে গাঁথিয়া দিবে, গ্রামকে সচেতন করিয়া গণ-আন্দোলনের সহস্র সহস্র কেন্দ্র সৃষ্টি করিতে পারিবে এবং পরিশেষে অহিংস বিপ্লব ঘটাইবে। চরকাকে এই চোখে দেখিয়া এই কাজে লাগাইতে হইবে। এইজন্যই গান্ধীজী তাঁহার জন্মোৎসবকে খাদি-উৎসব বলিয়া, খাদির মধ্য দিয়া তাঁহার সমস্ত কর্ম্মক্রমকে দেখিতে ও বুঝিতে আহ্বান করিয়াছেন।

"তোমার রাখাল তোমার চাষী"

"সোনার বাঙলা" বাঙালীর প্রাণের গান। তখন স্বদেশীর প্রথম যুগ; সারা বাঙলায় দেশপ্রেমের ঢেউ উঠেছে, বাঙালীর মরা গাঙে বান ডেকেছে, জয় মা ব'লে তরী ভাসাবার আহ্বান দেশের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হ'য়েছে। সে আহ্বান কবির অন্তঃপুরে পৌঁছল, আর আমরা পেলুম নতুন গান, নতুন কথা, নতুন সুর। ফাল্গুনের আমের বনে আর অঘ্রাণের ধানের ক্ষেতে, নদীতীরে বটের ছায়ায় ও পারের খেয়ায়, সন্ধ্যার গৃহদীপে ও মায়ের স্নেহকোলে, সৌন্দর্য্যের রেখায় রেখায় পল্লী-বাঙলার যে সরল উদার মূর্ত্তিখানি "সোনার বাঙলা" গানে ফুটে উঠলো তা সত্যই অনুপম। এই গানের মধ্যে কবি আপন হৃদয়ের প্রেম ও মাধুর্য্য কতই না ঢেলে দিয়েছেন! এই গানেই আছে,—

"আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী।"

আজ বাঙালী স্বদেশী গান ভুলে গেছে,—বাঙলার নানা দুর্ভাগ্যের মধ্যে এইটি খুব বড়। অতি আধুনিক কলাবিলাসী প্রাণের উৎসমুখে সৌন্দর্য্যের সন্ধান করতে আজ ভয় পায়। যেখানে দুঃখ বেদনা হাহাকার, সেইখানে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে প্রেম ও

পুরুষকারের জয়গানের মধ্যে সুন্দরকে খুঁজতে তাদের সাহসে কুলায় না। তাই রাখাল ও চাষীর একান্ত হতশ্রী দশায়, আর দিন-মজুরের অন্তহীন অকথ্য দুর্দ্দশায় সমবেদনা ও সেবার কথা উঠ্‌লে ঝঞ্ঝাটই শুধু বেড়ে চলে, ভাববিলাসীর ভয়কুণ্ঠিত মন সাহিত্যের মালমসলার সন্ধান সেখানে পায় না। তবু স্বীকার করতেই হয়, "সোনার বাঙলার" রাখাল ও চাষীকে একদিন কল্পনায় কোল দেবার পর সেই ভালবাসাকে কর্ম্মগত করবার সময় আজ এসেছে। নবযুগের এই কর্ম্মচাঞ্চল্যের বুক থেকেই নবীন সাহিত্যের জন্ম হবে। দেশের মাটি, দেশের হাওয়া, দেশের সহজ মানুষ, তাদের সহজ মন, দেশের বিরাট সমাজ ও তার চিরন্তন সাধনাই হবে এই সাহিত্যের অবলম্বন। কোটি নরনারীর দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আর ভারতের যুগ-যুগ-সঞ্চিত সাধনার মর্ম্মকথাই হবে এই সাহিত্যের প্রাণ। দেশের মাটির সুনিশ্চিত ভিত্তির উপর থেকে এই সাহিত্য হাতযোড় ক'রে দাঁড়াবে ঊর্দ্ধে দেবতার দিকে, যাঁর ইঙ্গিতে বিশ্ব জুড়ে ভাঙাগড়ার তরঙ্গ-হিল্লোল চলেছে। নিজের বিশেষকে অবলম্বন ক'রেই এই সাহিত্য নির্ব্বিশেষের দিকে প্রয়াণ করবে। যেখানে অনুভূতি নেই, আছে শুধু অনুকরণ, চিত্ত যেখানে পরভাবমুগ্ধ ও পরচিন্তালুব্ধ, বুদ্ধি যেখানে বিকারগ্রস্ত ও মোহাভিভূত, হৃদয় যেখানে মহাভাবের উর্ম্মিভঙ্গে আন্দোলিত হয় না, কল্পনা যেথায় পরাজিত মনের পরিধি ছাড়িয়ে মুক্তির আকাশে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পায় না, সেখানে শুধু কথা গেঁথে

গেঁথে যে সাহিত্য সৃষ্ট হয় তার গতি, ভঙ্গী, কৌশল যতই পরিপাটী হোক্ না কেন, প্রকৃত সৃষ্টির স্বচ্ছন্দ আনন্দ সেখানে নেই, কৃত্রিমতার আবহাওয়ায় সে দুষ্ট ও অবরুদ্ধ, দেশের বিরাট সমাজের সঙ্গে সে সম্পর্কশূন্য, নিখিল ভুবনের ভুবনমোহন সে সাহিত্য থেকে নির্ব্বাসিত। নতুন সাহিত্যের সন্ধান এ পথে মিলবে না। তার উদ্ভব হবে দরদীর মর্ম্মস্থল থেকে যেখানে ভালবাসার শতদল সৌন্দর্য্যে টলটল করছে, যার বিশাল বুকে আশ্রয় রয়েছে কোটি নরনারীর, যাদের—

"বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার।"—

বুকে যার দুরন্ত আশা ও অফুরন্ত ভালবাসা, সর্ব্বহারাদের জন্যে সেই আজ বুক পেতে দিতে পারবে, অন্য কেহ নয়। সারা দুনিয়া জুড়ে হুজুর-মালিকদের যুগ আজ অবসানপ্রায়, দিক্-চক্রবালে গণযুগের নবারুণোদয়ের আভাস দেখা যাচ্ছে। ভারতবর্ষে গান্ধী-যুগ ভারতীয় গণযুগেরই অগ্রদূত। গণ্ডীবদ্ধ জীবনের নিরাপদ আরামের মধ্যে যে সৌখীন সাহিত্যের চাষ হয়, এই গণযুগের প্রতিচ্ছবি তার মধ্যে খুঁজতে যাওয়া সত্যই বিড়ম্বনা। ভারতের কোটি কোটি জনগণের দুঃখ-বেদনার পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে যারা আলোর সন্ধান নিয়ে আসবে, ভারতের অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন, আশাহীন লক্ষ লক্ষ গ্রামের মহাশ্মশানে শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে যারা দেশে "নূতন জীবন বপন" করতে পারবে, সেই তপস্বীর দলের

মধ্যে কোন কোন ভাগ্যবানের মনোবীণায় নূতন রাগিণীর ঝঙ্কারে ও তালে নূতন সুর, নূতন গান ও নূতন কথার সৃষ্টি হবে। ভাবী সাহিত্যের সৃষ্টিকেন্দ্র সেইখানে,—সেই দুঃখ-বেদনা, সেই কুণ্ঠাহীন সেবা, অন্তহীন সমস্যা ও বিরামহীন কর্ম্মচেষ্টার অভিনব ও বিপ্লবী আবহাওয়ার মধ্যে। "তোমার রাখাল তোমার চাষীর" বুকভরা ভালবাসার সুরের সঙ্গে সেই নব সাহিত্যের সুরের সত্যকার মিল দেখতে পাওয়া যাবে।

বঙ্কিম-রবি-শরৎ যে সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন, অর্ব্বাচীনের নর্ম্ম-কৌতুকের নষ্ট নীড়ের মধ্যে তার প্রাণধারা লুপ্ত হয়ে যাবে না।

পল্লীপ্রসঙ্গে অরবিন্দ

বঙ্গভঙ্গের কারণে ১৯০৫ সালে বাঙালীর যে আশাভঙ্গ হয়, তারই বেদনা ও জ্বালার মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন জন্মলাভ ক'রে দেশসেবার নূতন ও ব্যাপক আদর্শ সৃষ্টি করেছিল। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তখন গৌরবের আসন ছিল বাঙালীর। শুধু চিন্তারাজ্যে নয়, কর্ম্মক্ষেত্রেও বাঙালী ছিল সকলের অগ্রণী।

পল্লীপ্রসঙ্গে অরবিন্দ

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'—গীতার এই অমোঘ বাণী বাঙালীর মর্ম্মে বেজেছিল, এই বাণী মুক্তির মহাবাণী হ'য়ে জাতিকে আপন দুর্জ্জয় ও দুর্নিবার শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। স্বাধীনতার পথে জাতির প্রকৃত অভিযান তখনই সুরু হ'য়েছিল, যখন বাঙালী পরের দ্বারে মুক্তিভিক্ষার বৃহৎ লজ্জা থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতাকে একমাত্র পাথেয় ব'লে গ্রহণ করেছিল।

১৯২০ সনের মত, ১৯০৬ সনের কংগ্রেসও ভারতের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় নূতন চিন্তা ও নূতন কর্ম্মপদ্ধতির প্রয়োগ ক'রে দেশের তদানীন্তন চিন্তা ও কর্ম্মক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন ক'রেছিল। বাঙালীর ভাগ্য ও গৌরবের কথা,—এই উভয় কংগ্রেসেরই অধিবেশন হ'য়েছিল কলকাতায়। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার সাধনে জাতি স্বাবলম্বনের পথ প্রথম ধ'রেছিল এই ১৯০৬ সনের কংগ্রেস থেকে। প্রাতঃস্মরণীয় দাদাভাই নৌরজী মহাশয়ের সার্থক নেতৃত্বে ও তিলক-অরবিন্দের সমর্থ কর্ম্মপ্রেরণায়, কংগ্রেস ১৯০৬ সনের অধিবেশনেই নির্ভীক ও মুক্তকণ্ঠে প্রথম প্রচার করেছিল যে 'স্বরাজ' লাভই আমাদের রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য। আর তার সাধন হিসাবে গ্রহণ ক'রেছিল 'স্বদেশী' 'বয়কট' ও 'জাতীয় শিক্ষা'র স্বাবলম্বনমূলক অভিনব প্রস্তাবত্রয়। এইরূপে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার পথে জাতীয় আন্দোলন ক্রমে ব্যাপক, গভীর ও দৃঢ়সম্বন্ধ হ'য়ে উঠলো। আঘাতের পর আঘাত পেয়ে জাতির মেরুদণ্ড হ'তে লাগলো মজবুত, আর তার

মজ্জায় সঞ্চারিত হ'তে লাগলো সাহস ও শক্তি। তারপর ১৯২০ সনে অহিংস' অসহযোগের মন্ত্রে নবশক্তি ও নবদৃষ্টি লাভ ক'রে পুরাতন 'স্বদেশী' 'বয়কট' ও 'জাতীয় শিক্ষা'র প্রচেষ্টা নতুন রূপ পরিগ্রহ ক'রে সারা ভারতে বিপুল কর্ম্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো। আন্দোলনের স্রোত এবার সহর ছেড়ে সহস্র সহস্র গ্রামের অভিমুখে প্রবাহিত হ'য়ে গণ-সংযোগের পথে জাতির মনে প্রাণে বিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি করতে লাগলো।

আজ ক্ষুদ্র এক অখ্যাত, অজ্ঞাত পল্লীর কঠোর দারিদ্র্য ও নিবিড় অজ্ঞতার মাঝে গান্ধীজী কর্ম্মসাধনায় নিরত আছেন; ভারতের পল্লীকে জাতির মুক্তিযজ্ঞে জাগ্রত করবেন,—এই তাঁর উদ্দেশ্য। বহু বর্ষ অতীত হ'ল,—স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে জাতি-গঠন ব্যাপারে পল্লীর স্থান নির্দ্দেশ ক'রে শ্রীঅরবিন্দ কি ব'লেছিলেন, আজ প্রকৃত গণ-সংযোগের দিনে সে কথার আলোচনা প্রাসঙ্গিক ও কৌতূহলকর হবে সন্দেহ নেই।

'পল্লীসমিতি' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় অরবিন্দ বলেছিলেন :—

"Swaraj begins from the village......If we are to organise Swaraj we must base it on the village"

স্বরাজ আরম্ভ হবে পল্লী থেকে, স্বরাজ গঠন ক'রে তুলতে হ'লে তার ভিত দিতে হবে পল্লীরই উপর। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও যা বলেছিলেন তার মর্ম্ম এই,—

পল্লীগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকোষের মত। মানব দেহ অসংখ্য

জীবকোষের সমষ্টি ; তেমনি বিরাট ভারতবর্ষীয় সমাজ লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র পল্লী নিয়ে গঠিত। পল্লীগুলি সুস্থ, সবল, স্বাবলম্বী ও স্বয়ংপূর্ণ হ'লেই ভারতে জাতিগঠন সম্পূর্ণ ও সার্থক হবে। প্রাচীন ভারতে জাতীয় জীবনের ভিত্তিই ছিল এই পল্লী, জাতির জীবনীশক্তির উৎস ছিল পল্লীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে। স্বরাজ-গঠন করতে হ'লে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে জাতিকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করতে হ'লে, জাতির জীবনের এই স্বাভাবিক কেন্দ্রগুলিকে বাঁচাতে হবে, তাদের ম্রিয়মান, অবসন্ন আবহাওয়ায় নতুন আশা ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সেই অনাদরের ভাঙ্গা ঘরে প্রীতির অর্ঘ্য নিয়ে গিয়ে শ্রদ্ধাভরে নিবেদন ক'রে দিতে হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা গোড়ার কথাই এই যে পরাধীনতায় কোন জাতিরই কল্যাণ নেই। বৈদেশিক শাসন কখনই জাতির স্বাভাবিক জীবনকেন্দ্রের সহিত যোগ স্থাপন করতে পারে না, অথচ এই স্বাভাবিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত যোগের মধ্য দিয়েই ক্রমশঃ জাতি গঠিত ও পুষ্ট হ'য়ে থাকে। বিদেশী শাসনের চাপে ভীত ও বিড়ম্বিত দেশ শাসনযন্ত্রটার পূজায় ও তুষ্টিবিধানে নিজের সব সঞ্চয় উজাড় ক'রে দেয়। ফলে, জীবনের এই স্বাভাবিক কেন্দ্রগুলি আপনাদের যোগসূত্র হারিয়ে ফেলে এবং ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষয়ের কারণে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। জীবনের সকল সমস্যার মীমাংসার জন্যে ঐ শাসনের দ্বারে ধর্ণা দিয়ে আমরা আত্মবিশ্বাস একেবারে হারিয়েছি ; আমাদের জাতীয় চেতনা লুপ্তপ্রায়, কর্ম-

শক্তি অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রাণের স্বাভাবিক কেন্দ্র পল্লী আজ শুধু অনাদৃত ও উপেক্ষিত নয়, লুণ্ঠিত ও মৃতপ্রায় অবস্থায় প'ড়ে আছে।

পরাধীন দেশে বৈদেশিক শাসন দেশময় তার স্পর্দ্ধা ছড়িয়ে দিয়ে খুব ঘটা ক'রেই চলতে থাকে, আর দেশের লোক হাঁ ক'রে তার দিকে তাকিয়ে তার শক্তির তারিফ করে। তাই গ্রামে গ্রামে দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথে যে সকল কর্ম্ম-কেন্দ্র স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে গড়ে ওঠে, সেগুলি তখন জাতির আত্ম-বিস্মৃতিজনিত অবহেলায় একপাশে পড়ে থাকে, আর দেশচিত্ত একান্ত মোহগ্রস্ত হ'য়ে বৈদেশিক শাসনটাকেই সকল কর্ম্মের কেন্দ্র, সকল চিন্তার আধার, সকল বিপদে আশ্রয় ও সকল দুঃখে ভরসা ব'লে গ্রহণ ক'রে আপনার শক্তি, সাহস, বুদ্ধির প্রতি একেবারে বিশ্বাস হারিয়ে বসে! বর্ত্তমানে আমাদের এই দুর্দ্দশা একেবারে চরমে এসে পৌঁছেচে। নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হ'লে গ্রামে গ্রামে জীবন-বিকাশের এই সব স্বাভাবিক কেন্দ্রগুলিকে উদ্ধার করতে হবে।

"পল্লী-সমিতি" গ্রামে গ্রামে এই উদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হলে মূর্চ্ছাহত দেশ আত্মসম্বিৎ ফিরে পাবে।

পল্লীসমিতি কি করবে?

বৈদেশিক শাসনযন্ত্রকে দেশের একমাত্র কর্ম্মকেন্দ্র ব'লে স্বীকার ক'রে জীবনের সব ক্ষেত্রেই আমরা আত্মনির্ভরতা

হারিয়েছি। তার ফলে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ, গ্রামে গ্রামে বিচ্ছেদ, জেলায় জেলায় বিচ্ছেদ, প্রদেশে প্রদেশে বিচ্ছেদ ঘটেছে। অন্য-নির্ভরতার এই প্রাণান্তকর পরিণাম থেকে দেশকে এই পল্লী-সমিতিগুলিই রক্ষা করতে পারবে। পল্লী-সমিতি শুধু চিন্তা করবে না, চিন্তাকে কর্ম্মগত করবে। পাঠ-শালা খুলে শিক্ষাদানের সঙ্গে পল্লীবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার ভার এই পল্লীসমিতিই গ্রহণ করবে। সমিতি-গুলি সালিসিতে মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি ক'রে দেবার দায়িত্ব নেবে, পল্লীস্বাস্থ্য, পল্লীরক্ষা, পল্লীর জনহিতকর সকল কার্য্যই তাদের উপর নির্ভর করবে। রোগে চিকিৎসা, দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় বিপন্নের সাহায্য,—এ সকলই সমিতিগুলি আপন কর্ত্তব্য ব'লে স্বীকার ও সম্পন্ন করবে। এইভাবে পল্লীর পরনির্ভরতা ও কর্ম্মপঙ্গুতার স্থলে আত্মনির্ভরতা ও কর্ম্মমুখরতা জেগে উঠবে।

আবার জনগণের রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করবার ভারও এই পল্লীসমিতিকেই গ্রহণ করতে হবে। বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক যুগে স্বরাজলাভের গোড়ার কথাই হচ্ছে গণ-জাগরণ। আজ দেশে স্বরাজ-লাভের জন্য যাঁদের মনীষা প্রকৃত মনন সুরু করেছে, পল্লীর জনগণের মন জাগিয়ে সেই চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের পরিচয় ক'রে দিতে হবে। তবেই পল্লীবাসী অনুভব করতে পারবে যে সমগ্র জাতির স্বাধীনতায় তার স্বাধীনতা, জাতির উন্নতির মধ্যেই তার উন্নতি, জাতির কল্যাণেই তার

কল্যাণ, জাতির জীবনেই তার জীবন। এইভাবে শিক্ষিত সাধারণ ও জনগণের বিচ্ছেদ ঘুচে মিলনের রাজপথ গ'ড়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে পল্লীসমিতিই গ্রামে গ্রামে স্বরাজের ভিত্তিস্থাপন করবে, প্রকৃত স্বরাজ কি গ্রামে গ্রামে তা অনুভব করিয়ে দেবে।

স্বরাজের জন্য আর চাই ঐক্যবোধ,—মতের ঐক্য নয়, ভাষার ঐক্য নয়; বুদ্ধিবিচারের নয়, ঐক্য হচ্ছে হৃদয়ের, দেশপ্রেম যার উৎস। জাতির মধ্যে অপ্রেম ও বিভেদ সৃষ্টি ক'রেই বৈদেশিক শাসন বেঁচে আছে। দুঃখ-বিপদে জাতি ও সমাজের নানা সমস্যার মীমাংসার জন্যে আজ আমরা দেশমাতৃকার দিকে চাই না, দেশ-ভাইদের ডাকি না। আমরা অসহায় শিশুর মত চেয়ে থাকি ঐ বিদেশী বড়কর্ত্তাদের দিকে,—যেন আমাদের জীবন-কেন্দ্র তাঁদেরই চরণের আশ্রয়ে। তাঁরাও অনুগ্রহের ফাঁদ পেতে, আজ হিন্দুকে আহ্বান ক'রে মুসলমানের উপর রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, আবার পরদিন মুসলমানকে মেহেরবাণী ক'রে হিন্দুকে করেন নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা। তাঁদের অনুগ্রহ-নিগ্রহের দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে হিন্দু-মুসলমান হায়রাণ হ'য়ে হ'য়ে পরমুখাপেক্ষী শিশুর অসহায় অবস্থায় নেমে গেছে। আজ পল্লীতে পল্লীতে পল্লীসমিতি প্রেম ও কর্ম্মের দ্বারা যদি প্রেম ও কর্ম্ম জাগাতে পারেন, গণ-কল্যাণের জন্য নিষ্ফল পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচিয়ে দেশের সর্ব্বত্র যদি আত্মনির্ভরতা, সহযোগিতা ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জাগাতে পারেন, তবেই জাতির জীবনের শুষ্ক উৎসমুখে

আবার নবজীবনের বিমল বারিধারার সঞ্চার হবে, খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন পল্লীসমাজ জাতীয়তা-বোধের স্পন্দনে জেগে উঠে বৃহত্তর জীবনের সহিত যুক্ত হ'য়ে সার্থক হবে। স্বরাজ-সাধনে এইরূপে পল্লীসমিতিগুলিই অগ্রণী হ'য়ে দেশের পরাধীন দশার অবসান ঘটাবে। দেশের যাঁরা দরদী, স্বাধীনতার যাঁরা প্রকৃত উপাসক, এই পথেই তাঁদের প্রেমের পরীক্ষা হবে।

আজ দেশের একটিমাত্র জেলার পল্লীতে পল্লীতে যদি আমরা এই সাধনাকে, এই কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে সফল ক'রে তুলতে পারি, তা'হলেই জীবনের স্বাভাবিক কেন্দ্রে স্বরাজের ভিত্তিস্থাপন করা হবে। এক কেন্দ্রের সার্থক কর্ম্মচেষ্টা অন্য কেন্দ্রে কর্ম্মের প্রেরণা জাগাবে, এক কেন্দ্রের আলোকে অন্য কেন্দ্র সত্য পথ দেখতে পাবে। স্বরাজের পথে দেশের অগ্রগতি তখন আর কেহ রোধ করতে পারবে না।

মন্দির-দ্বারে

[মহাত্মাজীর একটি বক্তৃতার ভাবানুবাদ,—'ইয়ং ইণ্ডিয়া' হইতে]

অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য ব'লে হিন্দু সমাজ যাদের দূরে রেখেছে, তাদের সেবাকে যে কোন প্রকার রাজনৈতিক কাজের চেয়ে আমি কখনও কম ব'লে ভাবি না। সেবাব্রত পালনের জন্যই আমি আজ রাজনীতিক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছি,—যখন বুঝতে পেরেছি যে রাজনৈতিক

কাজ ছাড়া সমাজসেবা কতকটা অসম্ভব। নিছক রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত থাকার চেয়ে পতিতের সেবায় আত্মশুদ্ধিলাভ করা আমার কাছে অনেক প্রিয়।

আর পতিতের সেবা কথাটির প্রকৃত অর্থই বা কি? সমাজে যারা আমাদের নিতান্তই আপনার, আমরা যুগ যুগ ধ'রে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে, তাদের শুধু নির্য্যাতন আর অপমান ক'রে এসেছি। মানুষ যখন তার মানবতা ভুলে গিয়ে পিশাচ হয়, তখন অপর মানুষের প্রতি সে যেমন ব্যবহার করে, এই হতভাগা ভাইদের প্রতি আমাদের সমাজ তেমনি পৈশাচিক ব্যবহার ক'রে এসেছে। অস্পৃশ্যতা-পরিহারই এই ভয়ঙ্কর পাপের প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র ব্যবস্থা। এটা নিছক ঋণশোধের ব্যাপার, তাদের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শন নয়,—হাজার বছরের সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, গরীবের প্রতি করুণাপ্রকাশ নয়। এই বহুযুগের ঋণ আজ যদি আমরা স্বীকার ক'রে পরিশোধ করতে আরম্ভ না করি, তবে হিন্দুসমাজ রসাতলে তলিয়ে যাবে। আমাদের সুখ-সুবিধা ও পরিচ্ছন্নতা-বিধানের জন্য যারা বংশের পর বংশ ধ'রে কত শ্রমই স্বীকার করেছে, আপন হাতে আমাদের ময়লা ধুয়ে এসেছে, তাদের লাঞ্ছিত, অপমানিত, নির্য্যাতিত ক'রে যে পাপের কালি আমরা মনের মধ্যে জমিয়ে তুলেছি তাকে আজ ধুয়ে ফেলতেই হবে,—এই প্রায়শ্চিত্তের মধ্যেই আমরা আত্মশুদ্ধির পথ দেখতে পাব।

তথাকথিত অন্ত্যজগণ হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে অন্যধর্ম্ম গ্রহণ

করবে অথবা আমাদের উপর প্রতিহিংসা নেবে, এই ভয়ে যদি অস্পৃশ্যতা-পরিহারের কাজ গ্রহণ করি, তবে একদিকে হিন্দু-ধর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা আর অন্যদিকে তাদের প্রতি আমাদের কৃতঘ্নতাই প্রকাশ পাবে। আবার এই অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের ব্যাপারকে অনেকে আমার রাজনৈতিক চাল ব'লেও মনে করেন। তাঁরা ভাবেন, পতিতদের হাতে রাখবার জন্যে আমি তাদের এই প্রকারে লোভ দেখাবার ব্যবস্থা করেছি! কিন্তু আমি জানি যে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য। হিন্দু সমাজকে অস্পৃশ্যতা পরিহার করতেই হবে, এ বিশ্বাস আমার কাছে একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হ'য়েই অস্পৃশ্যতা-পরিহার কংগ্রেসের কার্য্যতালিকার মধ্যে গ্রহণ করা হ'য়েছে, কেননা কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই হিন্দু এবং হিন্দু সমাজ যতকাল এই পাপের কলঙ্ক ধৌত না করবে, ততকাল হিন্দুরা স্বরাজলাভের যোগ্যতা ঠিকমত অর্জ্জন করতে পারবে না। যদি বা তার আগেই রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত হয়, তবে অস্পৃশ্যতা-পাপ ঢাকবার জন্যে সেই ক্ষমতার অপব্যবহারই হবে। এ বিশ্বাস আমার একদিনের নয়,—যতদিন স্বরাজের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি, ততদিন ধ'রে এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর হ'য়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ব্যাপারের উত্তেজনাই যাঁদের প্রাণের প্রিয় জিনিস, তাঁরা আমার এই একটি মন্দিরখোলার কাজের প্রতি অবজ্ঞা ও উপহাস ক'রবেন, কিন্তু তবুও এই কাজই আমার অতি প্রিয়, প্রাণের প্রিয়।

মন্দির আজ সবার জন্যেই খোলা হ'ল একথা মন্দিরের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ এখন স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু এঁরাই হয়ত একদিন বিরুদ্ধাচার ক'রে ব'লে বসবেন যে এ মন্দিরে দেব-পূজায় এঁরা আর একেবারেই থাকবেন না। বাস্তবিক সমস্ত ব্রাহ্মণসমাজ এবং গোঁড়া সম্প্রদায় একত্র হ'য়ে একদিন এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও করতে পারেন। তথাপি আমি আশা করি, আমি একান্ত মনে প্রার্থনা করি যে সেদিনও আপনারা আজকের এই সত্যবিশ্বাস দৃঢ়হৃদয়ে ধারণ করবেন এবং সেই দিনেই মন্দিরে বিগ্রহের যথার্থ প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'য়ে তথায় ভগবানের আবির্ভাব হ'য়েছে এই চিন্তায় প্রকৃত আনন্দলাভ করবেন।

অস্পৃশ্যতার ভারী বোঝা বহন ক'রছি ব'লে আমরা এখনও স্বরাজ লাভ করতে পারলুম না। হিন্দুরা সকলেই যদি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ ক'রে দেয়, তবে স্বরাজ আপনিই করতলগত হয়। বড় বা ছোট হওয়া ত জন্মগত ব্যাপার নয়। একে জন্মগত ক'রেই ত আমরা এমন সুন্দর বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে এমন বিকৃত, বীভৎস করে তুলেছি। ভগবানের কাছে সকলেই ত সমান, বামুন বা মেথর।

আজ যদি ব্যক্তিবিশেষের এই মন্দিরটি আপামর-সাধারণের কাছে উন্মুক্ত হ'য়ে থাকে, তবে যে সকল মন্দিরে সাধারণের ন্যায্য অধিকার, আর কতকাল তার দ্বার তাদের সকলের নিকট রুদ্ধ থাকবে? হিন্দুসমাজ আজ নবদৃষ্টি লাভ করুক! সকল মন্দির সকলের নিকট উন্মুক্ত হ'য়ে, এই শুভ আরম্ভ যেন শুভ

পরিণতি লাভ করে। সমাজ আর বেশীদিন অস্পৃশ্যতা-পাপ বহন করবে না। কিছুকাল আগে অস্পৃশ্যতা ধর্ম্মের অঙ্গ ব'লেই গণ্য হয়েছে। আর আজ এ সম্বন্ধে সমাজের মন উদাসীন! এই উদাসীনতা যখন ক্রমে জাগ্রত কর্ত্তব্যবোধে পরিণত হ'য়ে আমাদের আত্মশুদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ করবে, তখন অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন সম্পূর্ণ হবে। প্রার্থনা করি শীঘ্রই যেন সেদিন আসে।

মন্দিরদ্বার খুলে দিয়ে আজ আপনারা যে আত্মশুদ্ধির আয়োজন করলেন, এর জন্যে আমাদেরই আপন জন যদি আপনাদের পতিত ও সমাজচ্যুত ক'রে রাখে, তবে আমি আপনাদের অভিবাদন করবো। কারণ আজ প্রাণের টানে ভালবেসে আমাদের আলিঙ্গন করতেই হবে ঐ দলিত জনসঙ্ঘকে, যারা আমাদের শুধু দিয়েই এসেছে, পরিবর্ত্তে আমরা যাদের কিছু দিই নি,—কেবল সমাজের একটি প্রান্তে কোণঠাসা ক'রে দিয়ে, গণ্ডী টেনে যাদের দূরে ফেলে রেখে দিয়েছি। আজ শুধু অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের অনলেই আমাদের এ পাপ দগ্ধ হ'তে পারে।

দ্বার খুলিল

[শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই লিখিত Epic of Travancore নামক পুস্তক হইতে সঙ্কলিত]

(১)

ত্রিবাঙ্কুর একটি দেশীয় রাজ্য, ভারতবর্ষের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে হিন্দু রাজা। বহুশত দেবমন্দির এই রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্যমান। মন্দিরের গঠন, আয়তন, শিল্পশোভা শুধু আমাদের দেশের লোকের নয়, বিদেশী সমঝ্‌দার শিল্পীরও গভীর বিস্ময় উৎপাদন করে। ভারতের পবিত্র তীর্থ-বর্ণনায় আমরা অনেক সময় দ্বারকা হইতে পুরী এবং হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী,—এই কথা বলিয়া থাকি। এই কন্যাকুমারী হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থের মধ্যে অন্যতম, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ভারতবর্ষের দক্ষিণতম অংশে অবস্থিত। কন্যাকুমারী হইলেন উমা,—কঠোর তপস্যাবলে যিনি যোগীশ্বর মহাদেবকে পতিরূপে পাইয়াছিলেন। এই মন্দির বহু প্রাচীন। মহাভারতেও ইহার উল্লেখ আছে। ত্রিবাঙ্কুরের অন্যান্য মন্দিরে কোথাও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কোথাও শিব নটরাজ, কোথাও পদ্মনাভ প্রভৃতি ভগবানের নানামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ত্রিবাঙ্কুর-রাজ তাঁহাদের প্রাচীন রাজপ্রথা অনুযায়ী আপনাকে ‘পদ্মনাভদাস’ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

কিন্তু এত মন্দির, এত দেবতা, এত তীর্থ, এত দান ও পুণ্য, এত তপস্যা ও পবিত্রতার কাহিনী হিন্দুধর্ম্মের সহিত জড়িত থাকিলেও অস্পৃশ্যতা-ব্যাধি যুগ যুগ ধরিয়া হিন্দুসমাজের গভীর কলঙ্কস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এই অস্পৃশ্যতা-পরিহারের কথা মহাত্মা গান্ধী ভারতের কত শত সহস্র স্থানে, কত লক্ষ লক্ষ লোকের সম্মুখে বলিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই! মহাত্মাজী বলেন, অস্পৃশ্যতা পরিহার করিতে না পারিলে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। প্রকৃতপক্ষে এই অস্পৃশ্যতা-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া হিন্দুসমাজের মধ্যে সংহতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের, এক জাতিভুক্ত হিন্দুর সহিত অপর জাতি-ভুক্ত হিন্দুর সম্পর্ক শিথিলমূল হইয়াছে, সমাজ যেন ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। মানুষের স্পর্শে মানুষ অপবিত্র হয়, এমন অদ্ভুত অসম্ভব ব্যাপার আমাদের সমাজে শত শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং এই ভয়ঙ্কর জঘন্য নারকীয় প্রথা পবিত্র ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়া সমাজে স্বীকৃত, আদৃত ও পালিত হইতেছে। ফলে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাইয়া কোন রকমে জীবন ধারণ করাই যেন সাধারণ হিন্দুর নিকট একমাত্র ধর্ম্মপালন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের বাঙলাদেশেই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রথম বজ্র-নির্ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়াছিল। তারপর ক্রমে সুদিন আসিল। ১৯২০ সালের কালিকাতা কংগ্রেসে অস্পৃশ্যতা-পরিহারের প্রস্তাব ভারতবর্ষের সকল

প্রদেশ হইতে আগত প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। তদবধি মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় ও নির্দ্দেশে কংগ্রেস ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিবার জন্য ভারতব্যাপী যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহা আজ দেশবাসীর অবিদিত নাই। অস্পৃশ্যতার দুর্ভেদ্য দুর্গ আজ ভাঙ্গে নাই, কিন্তু তার নানাস্থানে ভাঙ্গন ধরিয়াছে এ বিষয়েও সন্দেহমাত্র নাই। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এই অস্পৃশ্যতা-পরিহার-আন্দোলন সফলতার দিকে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

ভারতের দক্ষিণে এই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রাকৃতিক শোভা অনুপম। নীল উন্মুক্ত আকাশ, নয়নাভিরাম পাহাড় ও নদী, বন ও চাষের ক্ষেত,—সকলে মিলিয়া দেশটিকে যেন ছবির মত সাজাইয়া রাখিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের লোকসংখ্যা ৫০ লক্ষ। রাজ্যের জনশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জলবায়ুর অবস্থাও উত্তম। বার্ষিক বারিপাত সুপ্রচুর। বহুবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া দেশে লক্ষ্মীর কৃপাও যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। এই রাজ্যের বর্ত্তমান রাজা ও মন্ত্রী (দেওয়ান) উভয়েই সুশিক্ষিত, কৃতবিদ্য, উদার এবং প্রজাসাধারণের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন। এমন সুন্দর ও মনোরম দেশে অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপের কারণে মানুষের প্রতি মানুষের মনোভাব ও ব্যবহার এমন অসুন্দর ও ভয়ঙ্কর হইয়া আছে দেখিয়া গান্ধীজী নিরতিশয় ব্যথিত হন। প্রকৃতপক্ষে অস্পৃশ্যতা এই রাজ্যে এরূপ ব্যাপক যে প্রতি পাঁচ জন হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে এখানে দুইজন অনাচরণীয়, সমাজে অচল। শুধুই অস্পৃশ্য নয়, বর্ণহিন্দু যখন

পথ চলেন, তখন অবর্ণ হিন্দুকে সসঙ্কোচে দূরে অবস্থান করিতে হয়, তাঁহার পবিত্র আবির্ভাবের সম্মুখে ইহারা আসিতেই পায় না। আর দেবদর্শনের জন্য মন্দিরে প্রবেশ করা দূরে থাক, মন্দিরের ত্রিসীমানায় তাদের আসা চলে না। আবার মন্দিরের দ্বারই যে শুধু তাদের কাছে রুদ্ধ তা নয়, যে সকল রাজপথ মন্দির অভিমুখে গিয়াছে, সে সকল পথও তারা মাড়াইতে পায় না। তাদের ছায়াই যে অপবিত্র তা নয়, আপন পরিশ্রমের বলে হিন্দুসমাজের মধ্যে বাঁচিয়া থাকাটাই যেন তাদের পক্ষে মহা অপরাধ। অথচ ত্রিবাঙ্কুরের প্রতি একশত জনের মধ্যে চল্লিশ জন এই অস্পৃশ্য, অনাচরণীয় অবর্ণ হিন্দু। এইরূপে একই হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সমাজের প্রায় অর্দ্ধেক লোকের সহিত অপর অর্দ্ধেকের কোন প্রকৃত সম্পর্ক নাই,—উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করেন না। এই অবর্ণগণের মধ্যে এজহাভা জাতি সংখ্যায় প্রায় দশ লক্ষ। ইহারা শিক্ষিত, সুসভ্য ও দক্ষ, যে কোন বর্ণহিন্দুর সহিত তুলনীয়। পুলয়া জাতির সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ,—ইহারা চাষবাস করে, ইহাদের হাতের ফসল ছাড়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণহিন্দুর একদিনও চলে না। পারিয়া জাতি সংখ্যায় প্রায় তিন লক্ষ,—দৈহিক শ্রম করিয়া জীবন যাপন করে। ইহাদের পরিশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্যাদি মন্দিরে ব্যবহারেও আপত্তি হয় না। এতদ্ভিন্ন সানার জাতি আছে, সংখ্যায় তিন লক্ষ। ইহারা উত্তর ভারতের পাসিদের ন্যায়। ইহারা খেজুর, তাল প্রভৃতি গাছের রস সংগ্রহ করিয়া গুড় তৈয়ারী করে। সকল সম্প্রদায়ই স্বচ্ছন্দে সেই গুড়

ব্যবহার করে। তথাপি এই চারি জাতি ত্রিবাঙ্কুরের হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য, ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত ছিল। কিন্তু গত ১৯৩৬ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখের রাজকীয় ঘোষণায় ইহাদের কাছে মন্দির-দ্বার খুলিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরে নবযুগের উদয় হইয়াছে। সেই কথাই বলিতেছি।

(২)

অস্পৃশ্যতা আমাদের দেশে অতি পুরাতন ব্যাধি। ইতিহাসে দেখা যায়, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন আচারহীন, অপরিচ্ছন্ন জাতিগণ ভারতীয় সমাজে অস্পৃশ্য ছিল। আর আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুসভ্য ও পরিচ্ছন্ন হইলেও বহু জাতি অস্পৃশ্য ও অনাদৃত এবং অস্পৃশ্যতাবিষে সমস্ত হিন্দুসমাজ জর্জ্জরিত। এক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক খৃষ্টান পাদরী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"গান্ধীজী জানেন যে অস্পৃশ্যতার মূলে আছে ধর্ম্মবিশ্বাস। তাই তিনি অবর্ণগণের জন্য মন্দিরদ্বার মুক্ত করিতে চাহেন। কারণ মন্দিরে দেবদর্শন হিন্দুধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ। মন্দির সম্পর্কে অস্পৃশ্যতা যদি দূর হয়, তবে সমাজের অন্য ক্ষেত্রেও অচিরে অস্পৃশ্যতা-দোষমুক্ত হইতে পারিবে; কিন্তু গান্ধীজীর মত মনীষী ও তাঁহার উচ্চমনা সহকর্ম্মিগণের একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও একজন অবর্ণহিন্দু মন্দির অভিমুখে একপদ অগ্রসর হইবার অধিকার আজও পাইল না।" পাদরী সাহেব

জানিতেন না যে তাঁহার এই আক্ষেপোক্তি প্রকাশিত হইবার পর, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই অঘটন-ঘটন সম্ভব হইয়া ত্রিবাঙ্কুরে সকল মন্দির দ্বারই সবার জন্য উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল ?

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ভাইকম-সত্যাগ্রহের কথা উল্লেখ করিতে হয়। ত্রিবাঙ্কুরে ভাইকম নামক স্থানের মন্দির অতি বিখ্যাত। মন্দির সম্পর্কে অবর্ণগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এইস্থানে ১৯২৪ সনে প্রথম সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে ভারতের শত শত স্থানে অস্পৃশ্যতা-পরিহারকল্পে বহু সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। জনমত তখন ধীরে ধীরে এই সাধু প্রস্তাব ও সত্য চেষ্টার অনুকূলে গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। অস্পৃশ্যতাব্যাধি দক্ষিণ ভারতে অতিশয় প্রবল ও ভয়ঙ্কর হওয়ায় সে সময়ে ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনও তথায় ব্যাপক ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। টি, কে, মাধবম্, কেশব মেনন, পরমেশ্বর পীলাই, পদ্মনাভ পীলাই প্রভৃতি অবর্ণ ও সবর্ণ উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃগণ নানা সভা সমিতি, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান হইতে এই সমস্যা সম্পর্কে ত্রিবাঙ্কুরের জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তুলিতেছিলেন। এই সময়ে গান্ধীজীর সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাঁহার সম্মতি লইয়া ভাইকমে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইল। এই সত্যাগ্রহের মুখ্য উদ্দেশ্য মন্দির-প্রবেশ হইলেও, তৎকালে প্রথম উদ্দেশ্য হইল মাত্র মন্দিরপথে প্রবেশ। কারণ মন্দিরের ত কথাই নাই, মন্দির অভিমুখে যে পথগুলি গিয়াছে তাহাতে প্রবেশ করাও অবর্ণের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ

ছিল। সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়া গেল। ত্যাগ ও দুঃখ-বরণের পালা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সকল প্রদেশের দৃষ্টি তখন ভাইকমের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। ভাইকম সত্যাগ্রহ হইতেই প্রথম স্পষ্ট বুঝা গেল অস্পৃশ্যতারূপ ব্যাধি হিন্দু সমাজে কিরূপ উৎকট ও মারাত্মক হইয়া আছে।

এই আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থা এবং সাহসী সত্যাগ্রহীদের আত্মত্যাগের কথা যথাযথ বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। ইহার সাফল্য সম্বন্ধে মোটের উপর এই কথা বলা যায় যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ১৯২৪ সনে এই আন্দোলন আরম্ভ হইয়া দ্বাদশবর্ষ পরে ১৯৩৬ সনে ইহারই পরিণতিস্বরূপ রাজকীয় ঘোষণা-বাণী দ্বারা রাজার সকল মন্দির সর্ব্বজাতির হিন্দুর জন্য মুক্ত হইয়া গেল, ভারতের একটি প্রান্তে স্থানীয় জনগণ কর্ত্তৃক এই সত্যাগ্রহ সম্পন্ন হইলেও সারা ভারতে সত্য ও অহিংসার পথে অস্পৃশ্যতারূপ পাপ ধ্বংস করিবার পথও ঐদিনই মুক্ত ও প্রশস্ত হইল।

এইবার ভাইকম-সত্যাগ্রহের একটু বর্ণনা করা যাক্। মন্দির অভিমুখে যে বিশেষ পথে সত্যাগ্রহীরা প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, রাজসরকার শক্ত বেড়া দিয়া সেই পথ উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিয়া রাখেন। ফলে সেই বাধা ও বেষ্টনীর পার্শ্বে রৌদ্র ও বৃষ্টি মাথায় করিয়া সত্যাগ্রহীদের নিয়ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। পথের একদিকে সত্যাগ্রহীর দল, অপরদিকে রাজপ্রহরীর দল। প্রাতে ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত প্রতিদিন সত্যাগ্রহ চলিতে থাকে। অহিংসার পথে এই সত্য চেষ্টা ও সত্য কর্ম্ম দেখিবার জন্য দিনের

পর দিন দলে দলে লোক জমিয়া যায়; তাহারা সকলেই সত্যাগ্রহীর ধৈর্য্য, বিনয় ও সঙ্কল্প দেখিয়া মুগ্ধ হয়; হৃদয় তাহাদের সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। এইরূপে অস্পৃশ্যতারূপ নিগড়ের গ্রন্থি একটির পর একটি করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, কখনও একবুক জল জমিয়া যায়, তবু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সত্যাগ্রহিগণ হাসিমুখে কর্ত্তব্য-পালনের জন্য যথাস্থানে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাদের ধৈর্য্যভঙ্গ হয় না। এইরূপে বৎসর পূর্ণ হইলে যখন ধৈর্য্যভঙ্গের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, তখন গান্ধীজী সত্যাগ্রহীদের উৎসাহিত করিয়া বলিলেন—"হাজার বৎসরের অন্ধ সংস্কারের আগল ভাঙ্গিবার জন্য এক বৎসরের দুঃখভোগ ত যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত নয়। ধৈর্য্য হারাইলেই অহিংস যুদ্ধে নিশ্চিত হারিতে হইবে। জোর-জবরদস্তি করিয়া কোনও কাজ হইবে না, শারীরিক বল-প্রয়োগও ব্যর্থ হইবে। বলপ্রয়োগ করিলে বিরুদ্ধপক্ষের মন পাওয়া যায় না, তাহাদের মনে সত্যের সাড়া না পৌছিলে কোন প্রকার সংস্কারই স্থায়ী হয় না। সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা যতই কমিয়া যাক, জয়ের আশা যতই দূরে থাক্, সত্য ও অহিংসার পথ হইতে কোন অবস্থায় একতিলও বিচ্যুত হইলে চলিবে না। সত্যের পথে পূর্ণ আত্মবিলোপ, গভীর দুঃখভোগ, অটল ধৈর্য্য ও জলন্ত বিশ্বাসই আমাদের পাথেয়। সত্যকে সত্যই রক্ষা করে, সত্যই সত্যের পুরস্কার।"

ইহার পর গান্ধীজী ভাইকমে গিয়া সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে অবস্থান করেন। তৎপরে নম্বুদ্রী সমাজের গোঁড়া ব্রাহ্মণগণের

সঙ্গে এই বিষয়ে তাঁহার আলাপ-আলোচনা হয়। সর্ব্বত্রই এই গোঁড়ার দল জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদের দোহাই দিয়া অস্পৃশ্যতার সমর্থন করিতে চায়। ইহারা বলে, মানুষ কর্ম্মের ফলেই (তথাকথিত) নীচ অন্ত্যজ বংশে জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং নীচ অস্পৃশ্য হইয়াই তাহারা থাকুক, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। কর্ম্মবাদের এই অদ্ভুত ও বিকৃত ব্যাখ্যার বলে ইহারা সমাজে মানুষের প্রতি পশুর অধম ব্যবহারের সমর্থন করিতে লজ্জা পায় না। ইহারা ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের মর্ম্মকথা বুঝে না, বুঝিবার চেষ্টা করে না, চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করে না। কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মের খণ্ডন হয়, পুরুষকারের দ্বারা অদৃষ্টকে জয় করা যায় "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্"—গীতার এই মহাবাণী ইহারা মানে না, অথচ আপনাদিগকে ধর্ম্মের পালক বলিয়া মিথ্যা অহঙ্কার করে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ইহারা মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার করে, অথচ ভগবান যে সকলের, তিনি যে সর্ব্বময়, তিনি যে প্রেমময়, পতিতপাবন একথা ইহারা সহজেই ভুলিয়া যায়। এই সব অজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞানহীন, ধর্ম্মধ্বজীদের আধিপত্যের আশ্রয়ে অস্পৃশ্যতাপাপ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঁচিয়া আছে এবং হিন্দু সমাজকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের অন্ধতা ও যুক্তিহীনতা ইহার অধিক হইতে পারে এরূপ কল্পনাও কখন করা যায় না। তথাপি সত্যাগ্রহীকে হিমালয়সদৃশ ধৈর্য্য লইয়াই সত্যের পথে অগ্রসর হইতে হয়।

ক্রমে বৎসর কাটিয়া গেল। তারপর আরও কয়েকমাস

কাটিল। সত্যাগ্রহ তখনও চলিতে লাগিল। তারপর রাজপুরুষগণ সত্যাগ্রহের কারণে জাগ্রত জনমতের প্রভাবে আত্মমত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।—মন্দিরের তিনদিকের পথ সকলের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে সত্যাগ্রহের জয় আরম্ভ হইল। প্রথম জয়ের আনন্দে উৎসাহও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে সুচিন্দ্রম্ ও অন্যান্য মন্দিরপথ সম্পর্কেও সত্যাগ্রহ চলিল। অবশেষে সুবিচার ও সংস্কারের আশা পাইয়া সত্যাগ্রহ বন্ধ করা হইল। গান্ধীজী তখন সবর্ণগণকে অস্পৃশ্যতা-রাক্ষস বধ করিবার জন্য ক্রমাগত আন্দোলন চালাইতে পরামর্শ দিলেন। আন্দোলনের ফলে অবশেষে ১৯৩৪ সনের প্রথম ভাগে রাজসরকার ত্রিবাঙ্কুরের সমস্ত রাজপথ, রাজব্যয়ে প্রস্তুত কূপ, জলাশয় ও ছত্রাদি সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে ত্রিবাঙ্কুরে অস্পৃশ্যতা-পরিহারের প্রথম অধ্যায় শেষ হইল।

(৩)

এইবার মন্দির-প্রবেশের কথা! রাজপথ, কূপ, তড়াগ, ছত্রাদি সর্ব্বজাতির জন্য মুক্ত হইয়া ত্রিবাঙ্কুরের হিন্দুসমাজে নূতন আশা জাগিয়াছে, সবর্ণ ও অবর্ণ হিন্দুর মধ্যে হাজার বৎসরের ব্যবধানের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এখন সর্ব্বজাতির জন্য মন্দিরদ্বার মুক্ত হইলেই এই ব্যবধান মূলতঃ ঘুচিয়া যায়, হিন্দু সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার পথ পায় এবং এক ধর্ম্ম ও এক ভগবান,—শাস্ত্রের এই মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিয়া মৈত্রীর

সত্যপথে যাত্রা করিতে পারে। কর্ম্মিগণ আবার নূতন উৎসাহে মাতিলেন, তাঁহারা সঙ্কল্প করিলেন অস্পৃশ্যতারূপ বিষবৃক্ষকে সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে।

দক্ষিণের মন্দির এক বিরাট ব্যাপার। প্রত্যেক মন্দির শ্রীকোবিল, মণ্ডপম্, স্তূপম্, গোপুরম্, ধ্বজস্তম্ভ প্রভৃতি নানা অংশে বিভক্ত। মন্দিরে পূজা উৎসবাদির ব্যবস্থাও খুব জটিল। নানা পর্য্যায়ের বহুসংখ্যক পুরোহিত পদ্মনাভ প্রভৃতি সুবৃহৎ মন্দিরের নিত্যনৈমিত্তিক বিবিধ পূজাপাঠ-সমাপনের জন্য নিযুক্ত থাকেন। মন্দির সংক্রান্ত খুঁটিনাটি সকল ব্যাপার একান্ত শুচিতা-সহকারে সম্পন্ন হয়। কোথাও একটুমাত্র ত্রুটি ঘটিলেই প্রাচীন প্রথানুসারে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শোধন করিয়া লওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। বাহ্য শুচিতার যেখানে এত বাড়াবাড়ি, অস্পৃশ্যতার ব্যাপার সেখানে কত উৎকট, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এইরূপে গোঁড়া সনাতনীরা এই সকল দেবমন্দিরকে অচলায়তনে পরিণত করিয়া ভগবানের বিগ্রহকে আগলাইয়া রাখিয়াছে, আর মানুষকে সমাজে পতিত করিয়া রাখিয়া পতিতপাবন ভগবানকে নিত্য অপমান করিতেছে। তাই সর্ব্বলোকের জন্য "সর্ব্বলোক-মহেশ্বরের" মন্দির দ্বার আজ মুক্ত করিতেই হইবে। প্রাচীন অন্ধসংস্কার হিন্দু-সমাজের মনের উপর জাঁকিয়া বসিয়া থাকিবে, অথবা উদার সাম্যবুদ্ধির শুভ্র আলোকপাতে সমাজ নবজীবন লাভ করিবে, এই হইল এখন প্রশ্ন।

সংস্কারকের দল অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া

লাগিলেন। ভাইকম সত্যাগ্রহের সময় হইতেই জনমত সর্ব্বজনের মন্দির-প্রবেশের অনুকূলে গড়িয়া উঠিতেছিল। তারপর ১৯৩২ সনে হরিজন-সমস্যা সম্পর্কে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া গান্ধীজীর উপবাস-গ্রহণ এবং ১৯৩৩ সনে হরিজন-উন্নয়নকল্পে ২১ দিন ব্যাপী অনশন পালন,—এই দুইটি ব্যাপার অস্পৃশ্যতা-পরিহার-আন্দোলনকে নূতন শক্তি দিয়া গভীর ও ব্যাপক করিয়া তুলিল। প্রকৃতপক্ষে মহাত্মাজীর এই অনশন-ব্রতের মধ্য দিয়া সারা ভারতবর্ষে হিন্দু-সাধারণ অস্পৃশ্যতা ত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করিবার আহ্বান পাইল। এই সকল কারণে মন্দির-প্রবেশ সমস্যা লইয়া সর্ব্বত্রই আলোচনা ও আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। মালাবারে বিখ্যাত গুরুবায়ুর মন্দির আন্দোলনের একটা কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। হরিজন-সেবক-সঙ্ঘের সদস্যগণ সর্ব্বত্র প্রচার-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। মহাত্মাজীও এই সময়ে হরিজনের কল্যাণকল্পে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র নবচেতনা জাগাইতে লাগিলেন এবং গোঁড়া রক্ষণশীল সম্প্রদায়কে যুক্তি ও বিচার দ্বারা বুঝাইতে গিয়া নানাস্থানে কত ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, পরিহাস, উপহাস হাসিমুখে মাথা পাতিয়া লইলেন।

এই সময় ত্রিবাঙ্কুর সরকারও একটি মন্দির-প্রবেশ-কমিটি নিয়োগ করিয়া এই সমস্যাসম্পর্কে রীতিমত আলোচনা ও অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। সমস্যার সমাধান ইহাতে হইল না সত্য; কিন্তু

এই কমিটির বিবরণ হইতে দেখা গেল যে, ৩১২২ জন ব্যক্তির অধিকাংশই ইঁহাদের প্রশ্নমালার উত্তরে মন্দির-প্রবেশের অনুকূলে মত দিয়াছেন। এই সম্পর্কে ৩২৫ জন সবর্ণ হিন্দুর মধ্যে ২৩৮ জন এবং ২২ জন মহিলার মধ্যে সকলেই মন্দির-প্রবেশের পক্ষে ছিলেন।

ইহার পরই ডক্টর আম্বেদকারের নেতৃত্বে নাসিক হরিজন-সম্মেলন হইতে যখন প্রচার করা হইল যে, হরিজনগণ অস্পৃশ্য অনাদৃত ও অপমানিত হইয়া হিন্দুসমাজে আর থাকিবে না, হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে,—তখন আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় সমস্ত হিন্দু-সমাজ চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। অহিন্দু ধর্ম্ম-প্রচারকগণও সুযোগ পাইয়া হরিজন-গণকে নিজ ধর্ম্মে টানিয়া লইবার ব্যবসা চালাইতে খুব উদ্যোগ-সহকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে আঘাতের পর আঘাত পাইয়া হিন্দু-সমাজে নবচেতনার সঞ্চার হইতে লাগিল, এবং অবর্ণগণের মন্দির-প্রবেশের দাবী সকলেই মনে মনে স্বীকার করিতে লাগিলেন। যে সকল সবর্ণ হিন্দু গুরুবায়ুর মন্দির-প্রবেশের প্রধান বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এক্ষণে অবর্ণগণের মন্দির-প্রবেশের পক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন। আন্দোলন সুতীব্র হইয়া উঠিল।

অতঃপর শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহেরুর নেতৃত্বে কেরল প্রাদেশিক মন্দির-প্রবেশ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। সম্মেলনে ত্রিবাঙ্কুর রাজ-সরকারকে সর্ব্বজাতির জন্য সর্ব্বতোভাবে মন্দিরদ্বার মুক্ত

করিতে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল। সংস্কারকগণ সর্ব্ব-প্রকারে মন্দিরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিবার ও পূজার্চ্চনার শুচিতা মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মন্দির-প্রবেশের পক্ষে বহু-সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র ত্রিবাঙ্কুর-রাজসকাশে প্রেরিত হইল। চতুর্দ্দিকে সভাসমিতির অনুষ্ঠান হইয়া আন্দোলন ঝড়ের বেগে চলিতে লাগিল। হরিজনগণের কল্যাণকল্পে এই সমস্ত একান্ত আন্তরিক ও ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখিয়া ত্রিবাঙ্কুরে এজ্‌হাভা জাতীয় যে সকল অবর্ণ হিন্দু ধর্ম্মত্যাগের কথা ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারা সে ভ্রান্ত সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন, তাঁহাদের সংশয় দূর হইল। সবর্ণ ও অবর্ণ হিন্দু মিলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তন ও ভজন গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক সভায় উপস্থিত হইয়া মন্দির-প্রবেশের পক্ষে দাঁড়াইলেন। অতি-মাত্রায় রক্ষণশীল নম্বুদ্রী পরিবারের মহিলাও হরিজনকে ভাই বলিয়া অকুণ্ঠিতভাবে তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অস্পৃশ্যতা-পাপ পরিহার করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের শুদ্ধীকরণ কার্য্য চলিতে লাগিল এবং তাহার স্বপক্ষে জনমত প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। নেতৃগণ এই সম্পর্কে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ও মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং অবর্ণগণের জন্য মন্দিরদ্বার মুক্ত করিবার পক্ষে ৫০৫২২ জন সবর্ণ হিন্দুর স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র প্রধান সচিব রামস্বামী আয়ারের নিকট উপস্থাপিত হইল। অবশেষে ১৯৩৬ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখের ঘোষণাবাণী

দ্বারা রাজ্যের সকল মন্দির জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুর জন্য উন্মুক্ত হইয়া ত্রিবাঙ্কুরে অস্পৃশ্যতা-পরিহার চেষ্টার দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হইল। সহস্র বৎসরের আগল ঘুচিয়া গিয়া সবর্ণ ও অবর্ণ হিন্দুগণ তখন একত্রে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পদ্মনাভ বিগ্রহ দর্শন করিলেন।

জনমত পূর্ব্ব হইতেই গঠিত হইয়াছিল। ফলে অবর্ণগণ যখন বিভিন্ন মন্দিরে প্রথম প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তখন সবর্ণ সমাজ কোনরূপ বাধা দিলেন না, কোনও বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইল না। প্রায় দুই সহস্র মন্দিরের দ্বার এইরূপে খুলিয়া গেল। ভাইকমে একটি মাত্র মন্দিরের পথে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্য সত্যাগ্রহিগণ বৎসরাধিক ধরিয়া অশেষ লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন,—আজ দুই সহস্র মন্দিরের পথ শুধু নয়, দ্বার পর্য্যন্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত হইয়া গেল। ত্রিবাঙ্কুরে হিন্দুসমাজের ললাট হইতে একটা গভীর কলঙ্করেখা মুছিল। কন্যাকুমারী-মন্দিরে সর্ব্বজনের প্রবেশের দৃশ্য দেখিয়া, মাদ্রাজের নেতা আনন্দে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। সানার, পারিয়া প্রভৃতি যাহাদের ছায়া মাড়াইলে ভ্রান্ত ও অবিবেকী সবর্ণ হিন্দুগণ স্নান করিয়া পরিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন মনে করিত,—আজ বিধাতার অনুকম্পায় এবং মানুষের সত্যচেষ্টায় সেই তথাকথিত অস্পৃশ্য ভাইগণ, তাহাদের বালক-বালিকাগণ কন্যাকুমারী-মন্দিরের পবিত্র সরোবরে স্নান করিয়া হাস্যে মুখর, আনন্দে উজ্জ্বল ও সদ্যপ্রাপ্ত সামাজিক মুক্তির নেশায় পাগল হইয়া দুই হাজার বৎসরের

নিষেধের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিল। শঙ্খ বাজিল, ঘণ্টা বাজিল, আনন্দের লহর উঠিল। তপস্যানিরতা কন্যাকুমারী উমার বিগ্রহের সম্মুখে সবর্ণ ও অবর্ণ হিন্দুর দুই সহস্র বৎসর কালের বিচ্ছেদ ঘুচিয়া মিলনের মহামুহূর্ত্তের উদয় হইল।

অহিংস সংগ্রামের রীতি

গণ-আন্দোলনের কথা আজ দেশে সকলেরই মুখে কিন্তু গণ-আন্দোলন ত মুখের কথা নয়। বিপ্লব অচিরেই ঘটুক ইহা সকলেই চায়, কিন্তু উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেই বিপ্লব আসে না। অথচ এই ঘোষণার ঘোররবে বাংলাদেশ একান্ত আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে। কৃষকের দাবীর ফর্দ্দ তৈরী হচ্ছে, শ্রমিকের দাবীর ফর্দ্দ তৈরী হচ্ছে, লম্বা ফর্দ্দে গলতি কোথাও না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। দাবী উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতও হচ্ছে। বাঙলায় দেশময় ঘোষণার ঘনঘটা!

দেশের একান্ত দুরবস্থার মধ্যে বিপ্লবের পূর্ব্বাভাস র'য়েছে জানি। কোটি কোটি লোকের ক্ষুধানলের মধ্যে বিপ্লবের আগুন আছে একথাও মানি। তবুও বিপ্লব ঘটছে না কেন? প্রকৃত পক্ষে বিপ্লব ত আপনি জাগে না, অনুকূল অবস্থার মধ্যে তাকে

জাগিয়ে তুলতে হয়। সমাজের অর্থনৈতিক কারণপরম্পরার একটা অনিবার্য্য গতি আছে, তাদের দুর্ব্বার স্রোত একটা চরম পরিণতির দিকে অবশ্যই ছুটে চলেছে। কিন্তু এই গতিবেগকে সংযত, সংহত, নিয়ন্ত্রিত ও সুপ্রযুক্ত করবে বিপ্লবী। তবেই বিপ্লব আসবে। মাল-মসলা নিয়ে ইমারত তৈরী করে শিল্পী, মাল-মসলা আপনি কখন ইমারত হ'য়ে গ'ড়ে ওঠে না। মাত্র ক্ষুধার তাড়নায় যদি লোকে বিপ্লবের মধ্যে ঝাঁপ দিতে পারতো, তা হ'লে এই ভয়ঙ্কর গরীব দেশে বহুপূর্ব্বেই বিপ্লব ঘ'টে যেতো। কিন্তু তা ঘটেনি, কারণ অবস্থা অনুকূল হ'লেও বিপ্লবের ব্যবস্থা করবার লোক যথেষ্ট ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে অবস্থা আনুকূল হ'লেই বিপ্লবী মনোভাব জাগে না. সংগ্রামের মধ্যে আহ্বান করলেই লোক সংগ্রামশীল হ'য়ে ওঠে না। দেশে আজ জমিদার যথারীতি প্রজাকে শোষণ করছেন, মহাজন খাতককে আর ধনিক শ্রমিককে পিষ্ট করছেন। চাষীর ঘরে অন্ন নেই, শিল্পী ধ্বংসের মুখে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিতমহলে ঘর ঘর বেকারের দল ব'সে আছেন। অথচ গভর্ণমেণ্টের খাজনা ট্যাক্স ঠিকমতই আদায় হচ্ছে, রাজ্য দিব্য চলছে, বিপ্লব ঘটছে না। আমরা সভা করছি, দাবী জানাচ্ছি, সংগ্রামের জন্য সকলকে ডাক দিচ্ছি। কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু করতে হবে, যদি আমরা মনপ্রাণে বিপ্লব চাই।

যে সংগ্রামের মধ্যে আমাদের নামতে হবে, সে কি ধরণের, কি তার রূপ, কি তার অস্ত্র, আজ তা স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করা

চাই। হিংস্র সংগ্রামের কথা নিশ্চয়ই আমরা ভাবছি না। আমরা নিরস্ত্র জাতি, একান্ত রিক্ত ও নিঃস্ব। বৈজ্ঞানিক যুগের বিবিধ আশ্চর্য্য মারণ-অস্ত্র সংগ্রহের জন্য এবং তার প্রয়োগকৌশল শিক্ষার জন্য আমাদের এত বড় দেশের পক্ষে যে কোটি কোটি টাকার অর্থবলের প্রয়োজন তা নিশ্চিতরূপেই আমাদের আয়ত্তের বাহিরে, এটা অতি স্থূল বাস্তব সত্য। অন্য কোন কারণে না হোক, মাত্র এই এক কারণেই গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামকে আমাদের গ্রহণ করতে হ'য়েছে। গ্রহণ যখন করা হয়েছে, তখন অহিংস সংগ্রাম-সম্বন্ধে পরিষ্কার বোধ ও ধারণার প্রয়োজন হচ্ছে। অহিংস সংগ্রামের সহিত হিংস্র সংগ্রামের মূলতঃ মিল নেই—যদিও সাহস, শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা ও সেনাপতির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস, এই সকল গুণ উভয় প্রকার সংগ্রামেই সৈনিকগণের একান্ত প্রয়োজন। হিংস্র সংগ্রাম হয় যান্ত্রিক শক্তির দ্বারা, অহিংস সংগ্রামের একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে সত্যাগ্রহ, যা আত্মিক বা মনের শক্তি। বোমা, বন্দুক, কামান পয়সা দিয়ে সংগ্রহ ক'রে তার ব্যবহার শিখতে হয়। সত্যাগ্রহের অস্ত্র প্রত্যেক মানুষের নিজের মধ্যেই আছে। সর্বপ্রকার ভয় ও কাপুরুষতা পরিহার ক'রে মানুষ যখন সঙ্কল্পবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে অন্যায়কে মানে না, এবং তার জন্যে সকল প্রকার শাস্তি গ্রহণ করে তথাপি অন্যায়কারীকে আঘাত করে না, তখন বলা যায় সেই মানুষ সত্যাগ্রহ-অস্ত্রের ব্যবহার শিখেছে। হিংস্র ও অহিংস অস্ত্রের এই গোড়ার তফাৎটা আমরা বুঝি না অথবা বুঝতে চাই না। মারণ-অস্ত্রের প্রয়োগকৌশল যদি খুব নিয়ম ও

নিষ্ঠার সহিত শিক্ষা ক'রতে হয়, তবে সত্যাগ্রহ-অস্ত্রের শিক্ষার জন্যে নিয়ম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হয় না কেন? ফৌজ কুচকাওয়াজ করে, মারণ-অস্ত্রের ব্যবহার শেখে, তারপর যুদ্ধে যায়। সত্যাগ্রহফৌজেরও কুচকাওয়াজ আছে, তাকেও তার অভিনব অস্ত্রের ব্যবহার শিখতে হয়, তবে তার যুদ্ধে যাওয়া চলে। বিনা অস্ত্রে, বিনা শিক্ষায় কেবল লোকের ভিড় জমিয়ে লড়াই ফতে করা যায় না। সুতরাং দেশব্যাপী অহিংস-যুদ্ধের জন্য লোকের মনকে তৈরী করবার একান্ত প্রয়োজন আছে।

যাঁদের নিজের মন তৈরী হয়েছে, সত্যাগ্রহের আলো যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা যদি দেশের গ্রামে গ্রামে কর্ম্মকেন্দ্র রচনা ক'রে জনসাধারণের সঙ্গে যোগস্থাপন করেন, তবেই জনগণের মন সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। সত্যাগ্রহের ফৌজগঠনের এই একমাত্র উপায়। আত্মশক্তি বা স্বাবলম্বনই হ'ল সত্যাগ্রহের একমাত্র মন্ত্র।

গত বিশ বৎসরে একদিকে গঠনমূলক কাজ ও অন্যদিকে দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে জনগণের মধ্যে চেতনার সঞ্চার নিশ্চয়ই হয়েছে। কৃষক শ্রমিক জেগেছে, তাদের মধ্যে অসন্তোষ আজ ক্রমবর্দ্ধমান সন্দেহ নেই। এই জাগরণকে, এই নব-চেতনাকে বিপ্লবী মনোভাবে পরিণত করে দেশব্যাপী অহিংস সংগ্রাম আরম্ভ করতে হবে। সংগ্রাম আরম্ভ করবার দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর। আমরা যেন ভুলে না যাই যে কংগ্রেস একটা

সামরিক প্রতিষ্ঠান, কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতাই কংগ্রেসকে শক্তিশালী ক'রে রাখতে পারে।

আজ দেশের বিরাট জনসাধারণের মনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়েছে, এটা খুবই আশার কথা। দুঃখ দারিদ্র ও রোগের ভারে যে মন বহু যুগ ধ'রে জড় হ'য়ে প'ড়ে ছিল, আজ সেই মন সাড়া দিচ্ছে, আশা ক'রছে, সঙ্কল্প ক'রতে শিখেছে। শক্তির এই যে একটু চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে, এর সমস্ত গতিবেগ কি ক'রে কেন্দ্রে কেন্দ্রে সত্যাগ্রহ-সংগ্রামকে শক্তিশালী করে তুলবে এই হ'ল আমাদের চিন্তার কথা ও চেষ্টার ব্যাপার। গান্ধীজী বারম্বার গঠনমূলক কাজের কথা বলেছেন। গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়েই এই শক্তি সংহত ও নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে দেশব্যাপী সত্যাগ্রহের সৃষ্টি করতে পারবে। দরিদ্র জনসাধারণ আজ ভাতকাপড়ের দাবী করতে শিখেছে। কিন্তু দাবীর পশ্চাতে শক্তি চাই। নহিলে দাবী কখনও মিটে না। আজ অভাববোধের সঙ্গে তাদের সাহস জেগেছে কি? আজ শত শত কর্ম্মী যদি গ্রামে গ্রামে ব'সে পড়েন, চরকাকে কেন্দ্রে রেখে গ্রামের শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও পরিচ্ছন্নতা-বিধানের কাজে নজর দেন, গ্রামের লোকের সঙ্গে, তাঁদের সুখদুঃখের সঙ্গে মিলে মিশে এক হ'য়ে যান, তা হলে কর্ম্মীর সাহস তাঁদের মধ্যে অজ্ঞাতসারেই সঞ্চারিত হবে, কর্ম্মীকে দরদী ব'লে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারবেন। এই বিশ্বাস থেকেই প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হবে। সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের জন্য সহস্র সহস্র কেন্দ্রে কর্ম্মিগণকে এইরূপ শক্তির আধার হয়ে থাকতে হবে। গণ-মনের

মনস্তত্ত্ব এইরূপেই বুঝতে হবে। সংগ্রামের সময় এই সব কর্ম্মীই হবেন কেন্দ্রে কেন্দ্রে গণনায়ক। গ্রামের লোক এই সব পরিচিত, পরীক্ষিত, দরদী বন্ধুর আহ্বানে সাড়া দেবে। এই হ'ল সত্যাগ্রহের কুচকাওয়াজ, অহিংস 'টেক্নিক্'। গঠনমূলক কাজই হ'ল সংগ্রামের উদ্যোগপর্ব্ব। বিপ্লবের মনোভাব এই পথেই জাগবে। ভবিষ্যতের সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম বিপুল আকার ধারণ করবে এটা সুনিশ্চিত। তার জন্যে বিপুলভাবেই প্রস্তুত হওয়া চাই।

সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে সম্মানজনক আপোষ সকল সময়েই হ'তে পারে, কারণ সত্যাগ্রহের মধ্যে বৈরভাবের স্থান নেই। সত্যাগ্রহ বলবানের অস্ত্র। সত্যাগ্রহ-যুদ্ধের পশ্চাতে যতটুকু সত্যাকার শক্তি আছে ততটুকু জয়লাভ হবেই। কেহই তাহা রোধ করতে পারে না। সুতরাং আপোষ করলে লোকসান বা অপমান নেই। অহিংস-সংগ্রামের চরম রূপটাও একবার কল্পনা করা যেতে পারে। ধরা যাক্ রেল বন্ধ হ'য়ে গেল, কলকারখানা সব বন্ধ। বিদেশী মালিকের কারখানা বন্ধ হ'লে দেশী মালিকের কারখানাও চলবে না, বন্ধ ক'রে দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য কেনাবেচা আদান-প্রদান সব বন্ধ। ট্যাক্স খাজনা বন্ধ। গ্রাম ও সহরে যোগ নেই, গ্রামের লোক সহরে জিনিষপত্র আনে না। এইরূপে সত্যাগ্রহ সংগ্রামে জনগণ নিজের উপরই অবরোধ আনে, সৈনিক যত দুঃখ নিজের মাথার উপরই লয়। সত্যাগ্রহের গতিই এই!

অবরোধের সময় জার্ম্মানীতে লোকে কুকুরের মাংস খেয়েছিল, রাশিয়ায় আহত সৈনিকের ক্ষত ব্যাণ্ডেজের অভাবে পাতা দিয়ে বাঁধতে হয়েছিল, লণ্ডনে আলো জ্বলেনি, ইংলণ্ডের রাজার চায়ের সঙ্গে চিনি মেলেনি। অবরোধের অবস্থা চরম দুঃখের অবস্থা। দুঃখের এই চরম অবস্থা আমাদের দেশেও হবে। তখন বস্ত্রের অভাবে চরকার মহিমা বুঝতে পারা যাবে। দিকে দিকে প্রহার, নির্য্যাতন ও গুলি চলবে। অবশ্য রাজশক্তিও ক্রমে কাবু হ'য়ে আসবে। সেই অবস্থায় সম্মানজনক আপোষ দ্বারা শক্তির পর শক্তি সংগ্রহ করা, একটা জয় থেকে আর একটা জয়ের দিকে অগ্রসর হওয়াই ত সমীচীন ব'লে মনে হবে। প্রকৃতপক্ষে সত্যাগ্রহ-নীতির সঙ্গে সম্মানজনক আপোষের কোন বিরোধ নেই। আপোষহীন সংগ্রামের কথায় কল্পনা মুগ্ধ হয়। কিন্তু চরম ত্যাগ, অসহনীয় দুঃখ-বরণ, অনিশ্চয়ে ঝাঁপ দেবার দুর্ব্বার আনন্দ,—এ সকলের উপলক্ষ্য অহিংস যুদ্ধের সকল অবস্থায়ই বর্ত্তমান থাকে। আর যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থায় অর্থাৎ গঠন-মূলক কাজে ত কর্ম্মীকে তিল তিল ক'রেই আত্মদান করতে হয়। সেনাপতি যেমন সংগ্রামের পথে অগ্রসর হন, তেমনি আবশ্যক মত তাঁকে পিছু হঠতে হয়। তিনিই শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, যিনি বিরূপ অবস্থায় এমন ভাবে সুকৌশলে সরে দাঁড়াতে পারেন, যা'তে সৈন্যগণের আশা ভরসা বজায় থাকে, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে না যায়। গান্ধীজী অবস্থা বুঝে সংগ্রাম চালিয়েছেন, আবার আপোষও করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে জয়ে পরাজয়ে

দেশের মনে বিরাট সাড়া জেগেছে, দেশে অতি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

অহিংস সংগ্রামের রীতি বিচার করলে বুঝা যায় যে শ্রেণী-সংঘাত হিংস্র সংগ্রামে অত্যাবশ্যক হ'লেও সত্যাগ্রহে উহা প্রায় অচল। সাম্যবাদী বন্ধুগণ একথা পছন্দ করবেন না। আমরা কেবল তাঁদের একটা কথা ভেবে দেখতে অনুরোধ করবো যে হিংস্র ও অহিংস্র সংগ্রামে মূলগত প্রভেদ রয়েছে। শ্রেণীচেতনা জাগিয়ে তুললে তার সঙ্গে যে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও বৈরভাব জাগে তা হিংস্র সংগ্রামের প্রাণ. কিন্তু তার ভিতর অহিংস্র সংগ্রামের মৃত্যুবাণ। অনেকে মনে করেন সর্ব্বহারাদের শ্রেণীস্বার্থবোধ না জাগলে তারা চিরকালই তলায় পড়ে থাকবে। অতএব গান্ধীবাদ ও সত্যাগ্রহ আর যারই হিতসাধন করুক, গরীবের মুখ কখনো চায় না। কিন্তু এই ধারণাটি একান্ত ভ্রান্ত। গান্ধী-নীতির চরম পরিণতি সমাজে ধনবৈষম্য রাখে না। গান্ধীবাদের আদিতে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ ও মধ্যে কল্যাণ। কল্যাণময় সাধ্যের কল্যাণময় সাধন সমাজে তখনই সম্ভব হয়, যখন সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোর মধ্যে ধনী-দরিদ্র ভেদ থাকে না। বহু অকল্যাণের মূলই ত আছে এই ভেদের মধ্যে। তাই সর্ব্বহারাদের শ্রেণী-চেতনা জাগিয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষের গরল না তুললেও গান্ধীবাদ তাদের ঐহিক সুখবিধানের জন্য সমাজে যে অবস্থার সৃষ্টি করবে, তা সাম্যবাদের সৃষ্টি থেকে অভিন্নই হবে। আর এক কথা। শ্রেণী-বিদ্বেষ নাই বা জাগল। লোকসান ত কিছু

নেই। হিংস্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শাসন-ক্ষমতা বিশেষ একটা দলের হাতে গিয়ে পড়ে। তাতে জনসাধারণের প্রকৃত যোগ থাকে না। দলের কল্যাণ-বুদ্ধি জাগ্রত থাকলেই জনগণের মঙ্গল। কিন্তু ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা জাগিয়ে যে শক্তিশালী দল ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ক্ষমতার মদিরায় মত্ত হয়ে যদি তারা গণকল্যাণকে খর্ব্ব করতে থাকে, তবে সাম্যবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে পুরাতন সমস্যা নতুন ক'রেই দেখা দেয়। অহিংস সংগ্রাম সর্ব্বহারাদের শ্রেণী-স্বার্থবোধ তীব্র ক'রে তোলে না, কিন্তু তাদের মনুষ্যত্ব জাগায়, ভয় ভাঙ্গায়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আনে। সুতরাং লোকসান কোথায়? সত্যাগ্রহ যে স্বরাজ-সৌধ গড়বে, তার বনিয়াদ হবে সারা দেশে জনগণের জাগ্রত মনের উপর। বিদ্বেষ না জাগিয়ে যদি জনগণের প্রাণ জাগান সম্ভব হয়, বৈরভাব পোষণ না ক'রে যদি দুঃখ বরণের দ্বারাই দুঃখ-হরণের পথ পাওয়া যায়, সত্যাগ্রহের শক্তি দ্বারা যদি সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করা চলে, তবে সাম্যবাদ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে পূর্ণতর ও শ্রেষ্ঠতর রূপ পায়। সাম্যবাদ সমাজের বাহিরের রূপে যে পরিবর্ত্তন আনবে, সে পরিবর্ত্তন স্থায়ী হ'তে পারে যদি সত্যাগ্রহের দ্বারা সমাজের অন্তরের পরিবর্ত্তন ঘটে। কারণ ভিতর ও বাহির পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। গান্ধীজী সম্প্রতি কৃষকদের বলেছেন—"I believe that the land you cultivate should belong to you." সাম্যবাদীদের লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন "My fundamental

difference with the socialist is well known.........
But let me tell you that we are coming nearer one another. Either they are being drawn to me or I am being drawn to them." এই সকল কথার অন্তর্নিহিত অর্থ ক্রমশঃ বুঝা যাচ্ছে।

আজ কি রাজনৈতিক কি সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের সকলকে সম্মিলিত হ'য়ে দাঁড়াতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থবোধ যতই জাগবে, সত্যাগ্রহের জন্য নিয়মানুবর্ত্তী সৈন্যদল গঠন করা ততই কঠিন হবে। সুতীব্র চেষ্টা দ্বারা সমাজের সকল স্তরে যদি শ্রেণী-চেতনা জাগিয়ে তোলা হয়, তবে আমাদের শক্তি সম্মিলিত হ'য়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হ'বে না, বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে আঘাত ক'রে দুর্ব্বল করবে। তাতে আমাদের পরাধীনতাই আরও কায়েমী হবে।

দেশের হাওয়া এখন কল্লোল-কোলাহলে খুব ভারী হয়ে উঠেছে। সকলেই খুসীমত সকলের সমালোচনা করছেন, সর্ব্বত্রই ভাঙ্গনের সুর। যাঁরা রাজনীতির কোনও সংবাদ কখন রাখেন নি, তাঁরাও নানাপ্রকার আজগুবি আষাঢ়ে গল্পে আসর জমিয়ে তুলছেন। সর্ব্বত্রই একটা শিথিল বিশৃঙ্খলা জমে উঠেছে। এই সময় শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে ক'দিন আগে গান্ধীজী যা বলেছেন তা ভেবে দেখা দরকার। তিনি বলেছেন "সংগ্রামের প্ল্যান বা ধারার বার বার পরিবর্ত্তন করেন নি অথবা শেষ মুহূর্ত্তে

হুকুম পাল্টে দেন নি, এমন সেনাপতির কথা আমি আজও জানি না। যুদ্ধের প্ল্যান তো যত্নরক্ষিত গুহ্য ব্যাপার, স্বয়ং সেনাপতি ছাড়া আর কেহ তা জানতেই পারে না।.........মুখটী বুজে হুকুম তামিল করাই হচ্ছে সৈনিকের কর্ত্তব্য। সত্যাগ্রহ-সৈনিকের পক্ষে ত ঐ কথা আরও জোর ক'রেই খাটে।........ সাধারণ যুদ্ধে সৈনিকের প্রশ্ন করার অধিকার নেই। তবু সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে প্রশ্ন করবার অবকাশ তার যথেষ্টই আছে। কিন্তু সেনাপতির কথার অর্থ বা উপযোগিতা যখন সে বুঝতে পারে না, তখন তর্ক না ক'রে তাকে সে সব বিশ্বাস ক'রেই নিতে হয়।"

কংগ্রেস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি বড় দুঃখে বলেছেন, "এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে এত বড় পরিবর্ত্তন ঘটতে পেরেছে কেবল একজন মানুষের ভরসার জোরে সেই ইতিহাসের বিস্ময়করতা হয়ত ক্ষণে ক্ষণে স্থানে স্থানে অস্বীকৃত হ'তেও পারবে এমনতর অকৃতজ্ঞতার আশঙ্কা মনে জাগছে।......দেশের যে একটা মস্ত মিলনতীর্থ মহাত্মাজীর শক্তিতে গ'ড়ে উঠেছে এখন সেটাকে তাঁরি সহযোগিতায় রক্ষা করতে ও পরিণতি দান করতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ..এ অবস্থায় মূল সৃষ্টিকর্ত্তার উপর নির্ভর রাখতেই হবে!...... দেশের সৌভাগ্যক্রমে দৈবাৎ যদি সে রকম শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয়, তবে তাঁকে তাঁর পথ ছেড়ে দিতেই হবে, তাঁর কর্ম্মধারাকে বিক্ষিপ্ত করতে পারবো না।" বাঙলার এই চিত্তবিক্ষেপ

ও দৃষ্টিবিভ্রমের দিনে বাঙালী কি রবীন্দ্রনাথের এই অমূল্য বাণী শ্রবণ ক'রে মাথায় তুলে নেবে ?